ব্রতচারীর মর্মকথা

গুরুসদয় দত্ত

বাংলার ব্রতচারী সমিতি
১২, লাউডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা
১৯৪০

মরমী ব্রতচারী বন্ধুবর

মনোজ বসুকে

ব্রতচারী-সংনির্ম্মাণ-সাধনায় অমূল্য সহযোগিতার

সকৃতজ্ঞ নিদর্শন-স্বরূপ

সাদর উৎসর্গ

সূচীপত্র

বাংলার স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারা

এটা আজকাল বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যা কিছু আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারি সবই মূলতঃ একটি সূক্ষ্ম নিরাকার শক্তির স্পন্দন মাত্র। এই স্পন্দন ছন্দমূলক; আমাদের স্থূল অনুভূতি দ্বারা আমরা সব জিনিসে এই ছন্দাত্মক স্পন্দনের উপলব্ধি করতে পারি না; কিন্তু আমাদের উপলব্ধির অক্ষমতা সত্ত্বেও সব জিনিসের অণু-পরমাণুতে সেই ছন্দময় স্পন্দনের অনন্ত উপস্থিতি রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের শরীরের প্রতি অণু পরমাণুতে এই ছন্দোময় স্পন্দনের প্রবাহ প্রতি মুহূর্তে বয়ে চলেছে। আমাদের মনের চিন্তাবৃত্তিও এই ছন্দোময় স্পন্দনের একটি প্রকাশ মাত্র।

মানুষের জীবনে ছন্দোময় বিশ্বপ্রকৃতির মূলীভূত এই ছন্দাত্মক স্পন্দনের দুটো প্রকার আছে। একটা তার শরীর ও মনের প্রত্যেক অংশের ও প্রত্যেক

বাংলার স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারা

অণু-পরমাণুর ছন্দধারা—যেটা তার ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত; অন্যটি হচ্ছে জ্ঞানতঃ অর্থাৎ ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত ছন্দ-শক্তির সাহায্যে তার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের ও মনোবৃত্তির সমন্বয়ী-কৃত চালনার শক্তি। এই দ্বিতীয় শক্তির অন্যতম নাম জীবনী-শক্তি। জীবিত প্রাণী আর জড় পদার্থ, এই দুটোর প্রত্যেকের অণুপরমাণুতে ছন্দোময় স্পন্দনের উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু জড় পদার্থে আর জীবিত প্রাণীতে এই তফাৎ যে, জড় পদার্থ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তার অন্তরকে ও বাহিরকে অর্থাৎ তার মনকে এবং শরীরকে ছন্দশক্তিতে চালিত, সমন্বিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না; কিন্তু একটি জীব তার মনকে এবং শরীরকে ছন্দশক্তি দ্বারা চালিত ও সমন্বিত করতে পারে।

এই ছন্দশক্তি প্রকাশের ক্ষমতা অন্যান্য জীবের চাইতে মানুষের বেশী। আবার বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এই ছন্দশক্তির মাত্রার বেশী কম বিভিন্নতা আছে।

এতক্ষণ আমরা শরীর ও মনের আলাদা উল্লেখ করে এসেছি। কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে

বাংলার স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারা

এটা স্বীকার করতে হয়েছে যে মন ও শরীরের মধ্যে কোন প্রাচীর-বিভাগ নাই। বস্তুতঃ মানুষের মনোবৃত্তি তার শরীরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এর থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, যে মানুষের তার শরীরের উপর পূর্ণ আয়ত্ত নেই, তার মনের উপরও তার পূর্ণ আয়ত্তলাভ হয় নি। শরীরকে ছন্দদ্বারা পূর্ণ আয়ত্তাধীন করতে না পারলে মনকেও পূর্ণ আয়ত্তাধীন করা যায় না।

মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ তার অন্তরগত ছন্দদ্বারাই সম্ভব—অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি জিনিসটাই ছন্দের একটা প্রকার। এইজন্য 'বিশ্বকোষ' অভিধানে 'ছন্দ' অর্থে 'অভিপ্রায়' লেখা হয়েছে। এ থেকে আমরা এটা বুঝতে পাচ্ছি, যার ছন্দশক্তির অল্পতা, তার মানসিক অভিপ্রায় ও ইচ্ছাশক্তিরও অল্পতা। যার ছন্দশক্তি প্রবল, তার মানসিক ইচ্ছাশক্তিও প্রবল ; সে তার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা শরীর ও মন দুটোকেই স-ছন্দ ও সু-নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

ছন্দশক্তির এই রহস্য এককালে বাঙ্গালী নরনারীর সহজজাত জিনিস ছিল। এর প্রমাণ

বাংলার স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারা

আমরা পাই একটা সাধারণ বাংলা শব্দ থেকে— শব্দটি হচ্ছে 'ছন্ন-ছাড়া' অর্থাৎ ছন্দ-ছাড়া বা ছন্দহীন। যে মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা নেই, চিন্তার সুসম্বদ্ধতা নেই, যার কার্য্যপ্রণালী খাপছাড়া এবং যার আচরণ, চাল-চলন ও গতিভঙ্গী সুষ্ঠু ও সু-সমঞ্জস নয়, তাকেই বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাষায় বলে ছন্ন-ছাড়া অর্থাৎ ছন্দ-হীন। সুতরাং মানুষের জীবনে ছন্দের শক্তিমত্তার ও একান্ত উপযোগিতার স্পষ্ট অনুভূতি বাঙ্গালী জাতির একসময়ে অস্থি-মজ্জাগত ছিল। সেই বাঙ্গালী জাতির আজকাল এত অধঃপতন হয়েছে যে তার শতকরা নিরনব্বই জন বা তারও বেশী তথাকথিত শিক্ষিত লোক জীবনে ছন্দ আনবার কথা বললে, সেটাকে বাতুলতা বলে বিদ্রূপ করে। এই অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির মনে আবার ছন্দশক্তির একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও শক্তিমত্তার উপলব্ধি আমাদের ফিরিয়ে আনবার সাধনা করতে হবে, যাতে করে আবার আমরা তার শরীর-মনের ছন্ন-ছাড়া ভাব দূর করে তাকে আবার স-ছন্দ ও সুষ্ঠু এবং অন্তরে বাহিরে পূর্ণ স্বাস্থ্যবান করে তুলতে পারি।

বাংলার স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারা

পূর্ব্বোক্ত অর্থে পৃথিবীর সকল দেশের মানুষকে হতে হবে স-ছন্দ অথবা সচ্ছন্দ, তা হলেই মানুষ তার 'স্ব-ভাব'-এর সন্ধান পাবে, তা হলেই সে মানুষ হিসেবে 'স্ব-স্থ' হতে সমর্থ হবে অর্থাৎ শরীর ও মনের স্বাস্থ্যলাভ করতে পারবে।

সকল মানুষের জীবনের এই যে মূলীভূত ছন্দের কথা বলা হল, এটা হল সার্ব্বভৌমিক ছন্দ; কিন্তু প্রত্যেক মানুষের জীবনের তুটো দিক আছে, একটা সার্ব্বভৌমিক দিক থেকে আর একটা স্ব-ভূমির দিক থেকে। সার্ব্বভৌমিক ছন্দের মূলীভূত ঐক্যের প্রকাশ হয় বিভিন্ন ভূমির বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন ছন্দের মধ্য দিয়ে। সুতরাং কোন মানুষ কেবল সার্ব্বভৌমিক ছন্দদ্বারা জীবনে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। পূর্ণতা লাভের জন্য তার প্রয়োজন তার স্ব-ভূমির ছন্দ-ধারার সঙ্গে তার জীবনকে সমন্বিত করা এবং সেই ছন্দধারার অনুক্রমে জীবনকে চালিত করা। এইটেই হচ্ছে প্রকৃত জাতীয়তা এবং সত্যকার বিশ্বমানবতা— অর্থাৎ বিশ্বমানবতার পূর্ণ ছন্দকে জীবনে প্রকাশ করতে হলে স্ব-ভূমির বিশিষ্ট ছন্দকে জীবনে সঞ্চারিত

করতে হবে। স্ব-ভূমির বিশিষ্ট ছন্দ-ধারাকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবের সার্ব্বভৌমিক ধারা অবলম্বন করবার চেষ্টা কখন সফল হতে পারবে না। এটা নিখিল সৃষ্টির একটি মূলীভূত সত্য—অর্থাৎ স্থানীয় বৈচিত্র্যকে অতিক্রম ও অস্বীকার করে নিখিল ভূমার বিশাল ঐক্যকে লাভ করা অসম্ভব।

বাংলা একটি বিশিষ্ট ভূমি। এই ভূমির জলে স্থলে আকাশে বাতাসে একটি বিশিষ্ট ছন্দধারা আবহমান কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সেই ছন্দধারা এখানে একটি বিশিষ্ট ভাবরূপে প্রকাশ পেয়েছে ও পাচ্ছে। সেই বিশিষ্ট ধারার প্রকাশ খালি কণ্ঠের ভাষায় নয়; দেহের শক্তির বৈশিষ্ট্যময় ভাষায় অর্থাৎ একটি বৈশিষ্ট্যময় নৃত্যধারায় সেই ছন্দধারারই প্রকাশ; চিন্তার ও ভাবের একটি বৈশিষ্ট্যময় প্রবাহে এই ছন্দধারার প্রকাশ হচ্ছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা বিভিন্ন কথায় বলি—বাংলার ভাষার ধারা, বাংলার নৃত্যের ধারা, বাংলার চরিত্রের ধারা, বাংলার ভাবধারা। এই সব ধারার যোগেতে

একটা মহাধারার গঠন—সেই মহাধারাকে এক কথায় আমরা বলি 'বাংলা' ও 'বাঙ্গালী'।

এই যে বাংলার বিশিষ্ট ছন্দধারার কথা বলা হল এটাই হচ্ছে বাংলার ও বাঙ্গালীর স্ব-ছন্দ অথবা স্বছন্দ। বাংলার এই স্ব-ছন্দ ধারার মধ্যে নিহিত আছে বাংলার ও বাঙ্গালীর স্ব-ভাব; সুতরাং এই স্ব-ছন্দ ধারাগুলি কি বাঙ্গালী ছেলে, কি বাঙ্গালী মেয়ে, কি বাঙ্গালী যুবক, কি বাঙ্গালী যুবতী, কি বাঙ্গালী প্রৌঢ়, কি বাঙ্গালী প্রৌঢ়া যখন আপনার জীবনে জাগ্রত ও প্রবাহিত করতে পারে, যখন সে এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যধারার সঙ্গে নিজের জীবনের সংযোগ স্থাপন করতে পারে; তখনই সে হয় 'স্ব-স্থ', তখনই সে হয় 'আত্ম-স্থ', তখনই সে হয় 'প্রকৃতি-স্থ', তখনই সে হয় 'আত্ম-প্রকৃতি-স্থ', তখনই সে হয় 'স্বাস্থ্যবান্', তখনই সে হয় 'স্ব-ভাব সম্পন্ন', তখনই সে হয় 'স্বচ্ছন্দ', তখনই সে হয় 'স্ব-অধীন' অর্থাৎ স্বাধীন, তখনই সে হয় বাধাশূন্য, তখনই সে হয় সুস্থ, তখনই সে হয় 'স্বাভাবিক', তখনই সে হয় 'সহ-জ' অর্থাৎ সহজ, তখনই সে হয় 'স্বাভিপ্রায়যুক্ত', তখনই সে

হয় অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় 'স্ব-তন্ত্র'। (আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখেছি যে 'চলন্তিকা' অভিধানে 'স্বচ্ছন্দ' কথার মানে 'স্বাধীন', 'বাধাশূন্য', 'অযত্নজাত' ও 'স্বাস্থ্যবান্'। আবার 'বিশ্বকোষ' অভিধানে অতিরিক্ত দু-তিনটি মানে দেওয়া হয়েছে—যথা, স্ব-অভিপ্রায়যুক্ত, স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছানুবর্ত্তী)

আমরা আজকাল প্রায়ই স্বাধীনতার কথা এবং মুক্তির কথা বলে থাকি। একটু তলিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারব যে, যে অর্থে স্বাধীনতার কথা বলে থাকি, সেটা অতিমাত্র বাহ্যিক অর্থে একটা বাহ্যিক স্বাধীনতার কথা মাত্র। কিন্তু বাংলার এবং বাঙ্গালীর সত্যিকার স্বাধীনতা লাভ করতে হলে একটি বাহ্যিক স্বাধীনতা লাভই তার চরম উদ্দেশ্য হলে চলবে না। বাঙ্গালী যদি জাতি হিসাবে, এবং বাংলার প্রত্যেক লোক বাঙ্গালী হিসাবে, বাঙ্গালীর ও বাংলার আত্মার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ভিতরে ও বাহিরের ভাবে ও ছন্দে একটা অন্য জাতির নকল স্বরূপ হয়ে যায়, তা হলে সে যদি বাহ্যিক স্বাধীনতাও পায় সেই স্বাধীনতাকে বাঙ্গালীর স্ব-অধীনতা বা বাংলার স্বাধীনতা বলার কোন বিশিষ্ট কারণ থাকবে

না। কারণ বাংলার স্ব-ছন্দ বা স্বচ্ছন্দ এবং স্ব-ধারা যদি বাঙ্গালী হারায়, তা হলে বিশ্বে দান করবার মত তার অবদান কিছু থাকবে না। শুধু সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হয়ে যদি সে বৃদ্ধি পায় তা হলে সে বিশ্বে বাংলার নিজস্ব দান কিছু কবতে পারবে না বলে তার কিছু মূল্যই থাকবে না।

সুতরাং যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করতে হয়, যদি বাঙ্গালী জাতিকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন বা স্ব-অধীন করতে হয়, তা হলে আমাদের রক্ষা করতে হবে বাংলার আত্মার বৈশিষ্ট্যময় ধারা-প্রবাহকে। এটাই হবে বাংলার আসল আত্মরক্ষা—বাংলার ও বাঙ্গালীর আসল স্বাধীনতার সফল সংগ্রাম—বাংলার ও বাঙ্গালীর আত্মরক্ষার সফল সংগ্রাম—বাংলার ও বাঙ্গালীর স্ব-স্বতারক্ষার সফল সংগ্রাম—বাংলার ও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যরক্ষার সফল সংগ্রাম—বাংলার ও বাঙ্গালীর স্ব-ভাব রক্ষার সফল সংগ্রাম—বিশ্বমানবের ভাণ্ডারে বাংলার ও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যধারার অবদান করবার সফল চেষ্টা।

অবশ্য বাংলার ও বাঙ্গালীর আত্মার স্ব-ছন্দ ও স্ব-ভাব ধারা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের করতে

হবে বাংলা ভূমির ও বাঙ্গালীর বাহ্যিক ও ব্যবহারিক ও আর্থিক সম্পত্তির রক্ষা ও সংবৃদ্ধির চেষ্টা। কিন্তু যে কথাটা আমি এখানে পরিস্ফুট করে বলতে চাই, সে কথাটা হচ্ছে যে এই বাহ্যিক স্বাধীনতার জন্যে আপ্রাণ সংঘবদ্ধ চেষ্টা নানা দিক দিয়ে করা চাই বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দরকার বাংলার আত্মার, স্ব-ছন্দের ও স্বভাবের আবহমান ধারার সঙ্গে যোগ স্থাপন করা, তাকে রক্ষা করা ও সংবৃদ্ধি করা—বাঙ্গালীর শরীরের পুষ্টির সঙ্গে তার চেয়েও যেটা মূল্যবান্ বেশি—বাঙ্গালীর স্ব-ভাবের ও স্ব-ছন্দের বৈশিষ্ট্যের ধারার রক্ষা ও পুষ্টি করা। বাহ্যিক ও আন্তরিক, এ দু'দিক দিয়ে সমান চেষ্টা করবার জন্যেই আমাদের সংঘবদ্ধ হয়ে অক্লান্তভাবে কৃত্য-সাধনা করতে হবে, তা হলেই আমরা বাংলা ভূমিকে আবার 'সোনার বাংলা'য় পরিণত করতে পারব। বাংলা ভূমির অবদান তা হলে বিশ্ব-মানবের ভাণ্ডারে সোনার চেয়েও শতগুণে বেশি মূল্যবান্ বলে গণ্য হবে। আর তা না হলে, অর্থাৎ যদি আমরা খালি বাহিরের স্বাধীনতা খুঁজি,

তা হলে বাংলা ভূমির ও বাঙ্গালীর মূল্য সোনার মূল্য হওয়া তো দূরের কথা, কাচের মূল্যের চেয়েও লঘু হয়ে পড়বে।

ব্রতচারী চায় বাংলার ও প্রত্যেক বাঙ্গালীর অন্তরকে তার স্ব-ভাবে ও স্ব-ছন্দে পরিপূর্ণ ও অনুপ্রাণিত করে দিতে, বাংলার ও বাঙ্গালী জাতির আবহমান ছন্দ ও ভাবধারার সঙ্গে তার সংযোগ স্থাপন করে দিতে—ব্রতচারী চায় যে বাঙ্গালী অন্তরের ভিতরে 'স্ব'-বিষয়ে অন্য জাতির অনুকরণ করা ছেড়ে দিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্যধারাকে যেন চেনে এবং তার ছন্দের সাধনা যেন করে। এক কথায় ব্রতচারী চায় প্রত্যেক বাঙ্গালীর মধ্যে একটা বাংলা-বোধ জাগিয়ে দিতে, আর তার সামনে ধরে দিতে এমন একটা পরিপূর্ণ আদর্শ—যাতে এক দিকে আছে বিশ্বমানবের জীবনের পূর্ণ আদর্শ, আর এক দিকে আছে বাংলার মানুষের পূর্ণ বৈশিষ্ট্যময় আদর্শ এবং বৈশিষ্ট্যময় ছন্দধারা। ব্রতচারী চায়—প্রত্যেক বাঙ্গালীকে করতে পূর্ণ বাঙ্গালী ও পূর্ণ মানুষ; তার ভিতরে জাগিয়ে দিতে বাংলার স্ব-ভাব ধারার প্রবাহের গৌরববোধ,

তাকে বোঝাতে চায় যে বাংলার স্ব-ছন্দ বা স্ব-ভাবের ধারাকে অতিক্রম করে অর্থাৎ পূর্ণ বাঙ্গালী না হয়ে পূর্ণ মানুষ হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব; তাকে বোঝাতে চায় যে বিশ্বের সামনে বাঙ্গালীর একটা গৌরবময় অবদান আছে, সেটা বিশ্বকে দেবার জন্যে তাকে একান্তভাবে অক্লান্তভাবে প্রস্তুত হতে হবে ও সাধনা করতে হবে—তাকে বিশ্বাস করতে হবে বাংলার ও বাঙ্গালীর এই বৈশিষ্ট্যময় ছন্দ ও ভাবধারার অস্তিত্বে ও গরিমায়; এবং সেই গরিমার ভাবধারা ও ছন্দধারার সঙ্গে পরিচিত হতে তাকে করতে হবে আজীবন চেষ্টা।

কয়েক দিন হ'ল গড়ের মাঠে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাংলার খ্যাতনামা এক বংশের এক জমিদারের সঙ্গে—তিনি নিজেও বিখ্যাত লোক, ধনী ও পদস্থ—অনর্গল চমৎকার ইংরেজী বলতে পারেন ও তাতে গৌরব বোধ করেন। দশটি কথা বলতে গেলে তার মধ্যে দু তিনটি কথা বাংলা বলে বাকি সাত-আটটি ইংরেজী বলতে পারলে গৌরব বোধ করেন। আমি যখন বললাম বাংলার বিশিষ্ট ছন্দধারার কথা—চরিত্রধারার, ভাবধারার

কথা—বিশ্বমানবের সামনে বাংলার একটি বিশিষ্ট অবদানের কথা, তিনি তখন আমাকে নিতান্ত পাগল মনে করে বিদ্রূপের উচ্চহাস্য করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে এক ঘণ্টা তর্ক হ'ল—তিনি বললেন বাংলার আবার একটা বৈশিষ্ট্য কি?—বাংলার ও বাঙ্গালীর কোন বৈশিষ্ট্য তিনি দেখতে পান না—বলেন তা কখনও ছিল না, আজিও নাই। তিনি বলেন—আমি এই যে এক ধুয়া তুলেছি বাংলার ভাবধারার ও ছন্দধারার বৈশিষ্ট্য নিয়ে; এতে বাংলা দেশ পিছিয়ে যাবে, আধুনিক সভ্যতার সহিত তাল রেখে সে চলতে পারবে না। এখন এ সব সাম্প্রদায়িকতা ছেড়ে দিয়ে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ করে তাদের মত হতে, তাদের ভাব, বুলি, আচার, আচরণ, আদব-কায়দা আমাদের অস্থিমজ্জাগত করতে হবে; তাতে হয়তো আমরা একটা বড় জাত হতে পারি, নতুবা অসম্ভব।

আমার এই জমিদার বন্ধুটি বাংলার আধুনিক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের একটি প্রতীকমাত্র। শত সহস্র. বাঙ্গালী আজকাল তাঁরই মত ভাব ও চিন্তা পোষণ করে। সিনেমাতে, রেডিওতে

রাস্তায় ঘাটে দেশে বিদেশে যেখানে যা কিছু আধুনিকতার আভাস পায় সেগুলির অনুকরণ করে—বাংলার ও বাঙ্গালীর অন্তর ও স্বভাবকে আধুনিক করবার জন্য তারা ব্যস্ত। আজকালকার বেশির ভাগ এই ধরণের বাঙ্গালী শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষের নিকট বাংলার বিশিষ্ট ভাবধারার ও ছন্দ-ধারার প্রসঙ্গ একটা বর্ব্বরতা ও বাতুলতার প্রকাশ-মাত্র বই আর কিছুই নয়। বাংলার ও ভারতের বাহ্যিক স্বাধীনতার ধুয়ায় বাংলার ও ভারতের আত্মগত স্ব-ছন্দ, স্ব-ভাবধারার স্বপ্নেও বা ভুলেও কোন খোঁজ এঁরা রাখেন না বা রাখা প্রয়োজন মনে করেন না, পরন্তু এ সব একটা অসভ্যতার নিদর্শন বলে মনে করেন।

সুতরাং আমাদের এখন বুঝতে হবে বাংলার ও ভারতের জীবন-মন একটা ভয়াবহ সন্ধিস্থলে এসে পৌছেছে যেখানে সে তার আত্মাকে হারাতে বসেছে। আমাদের বুঝতে হবে যে আত্মাকে হারিয়ে বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্য লাভ করাতেও নিছক ব্যর্থতা ছাড়া বিন্দুমাত্র সার্থকতা নেই। সুতরাং এখন প্রয়োজন সেই সাধনার—

বাংলার স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারা

যে সাধনার দ্বারা আমরা বাংলার স্ব-রূপকে পারব চিনতে এবং বাঙ্গালীর আত্মাকে করতে পারব আত্মস্থ, স্ব-ছন্দ সম্পন্ন—তার স্বভাবকে করতে পারব তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গরিমাময়, যাতে করে সমগ্র জগতের সামনে বাঙ্গালীকে আদর্শ জাতি করে তুলে ভারতের ও বাংলার সংস্কৃতিধারাকে বিশ্বময় প্রচার করে পাশ্চাত্য জগতের বর্ত্তমান অন্তঃসার-হীন ঐক্যহীন ও অধ্যাত্ম আদর্শহীন জীবনকে পুনরায় জ্ঞান শ্রম সত্য ঐক্য ও আনন্দময় আদর্শের পথে পরিচালিত করতে পারব। প্রত্যেক বাঙ্গালীর সামনে এই ব্রতের আদর্শ ব্রতচারী চায় ধরে দিতে। এই ব্রত পালন করতে হ'লে আমাদের প্রত্যেককে সোনার বাংলার বৈশিষ্ট্যধারাকে খুঁজে তাকে আপন আপন জীবনে আবার প্রবাহিত করতে হবে, বুক ফুলিয়ে আবার পূর্ণ বাঙ্গালী হতে হবে এবং প্রত্যেক বাঙ্গালীকে সেই পূর্ণ আদর্শের পথে চালিত করবার জন্য সাহায্য করতে হবে, বাঙ্গালী বলে আমাদের নিজকে অনুভব করতে হবে। বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গালীর পরস্পর অভিভাষণে সোনার বাংলার জয়-যাত্রার এই

অনুপ্রাণনাময় অনুভূতি আমাদের প্রতিনিয়ত অন্তরে জাগ্রত করে রাখতে হবে। বাঙ্গালী নরনারীর সঙ্গে বাঙ্গালীর দেখা হলে বুক ফুলিয়ে সগর্ব্বে উচ্চকণ্ঠে বলতে হবে—অভিভাষণ করতে হবে—জয় সোনার বাংলার—'জ—সো—বা'!

জ-সো-বা

(জয় সোনার বাংলার)

চির ধন্য সুজলা ভূমি বাংলার
জয় জয় সোনার বাংলার।
জয় জয় ভাষার বাংলার
জয় জয় আশার বাংলার
শস্যের শিল্পের সখ্যের ঐক্যের জ্ঞানের—
জয় মহা-প্রাণের বাংলার।

জ-সো-বা

আমরা বাঙ্গালী, বাংলা ভূমি আমাদের মাতৃ-ভূমি; বাংলার শক্তিধারা আমাদের মধ্যে অভিব্যক্ত, আমরা বাংলার ছন্দধারার মূর্ত্ত প্রকাশ—এই দেশাত্ম-বোধ প্রতিদিনের অজস্র কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত করে দিতে হবে। সর্ব্বদাই আমাদের মনে এই কথা জাগাতে হবে যে, আমরা বাঙ্গালী—সেই হিসাবে আমরা এক। বাংলার ব্রতচর্য্যার গোড়ার কথা এই যে বাংলা-বোধ, পরস্পর অভিভাষণ-প্রথার ভিতর দিয়ে তা প্রতিনিয়ত যাতে বাংলার ব্রতচারী স্মরণ পথে রাখতে পারে সেই জন্য অভিভাষণের সময় 'ই-আ' উচ্চারণের পরে আমরা বলব—'জয় সোনার বাংলার' অথবা সংক্ষেপে—জ-সো-বা!

'জ-সো-বা' বাক্যটার পুরো তাৎপর্য্য হ'ল এই যে, অভিভাষক ও অভিভাষিত উভয়ে পরস্পরকে জানাচ্ছেন—"আপনিও বাংলার ধারার অংশ,

আমিও বাংলার ধারার অংশ, বাংলার ভূমি, নদী, হাওয়া, জল, ফুল-ফল, গাছপালা, গরু-বাছুর, শস্য, শিল্প, বাংলার ভাষা, বাংলার কলা, বাংলার নৃত্য-গীত, বাংলার সংস্কৃতি সবই বাংলার শক্তির ধারার অংশ। এদের প্রত্যেকের ও সকলের দৌর্বল্যক্ষালণ শক্তিবৃদ্ধি ও জয় হউক—বাংলা ভূমি সোনার বাংলায় পরিণত হউক—এই উদ্দেশ্যে আমি আজীবন প্রযত্ন ও সাধনা করব; বাংলার শক্তি ও বাংলার বৈশিষ্ট্যধারাকে সঞ্জীবিত করব; বাংলার স্ব-ভাব ও স্ব-ছন্দধারার সঙ্গে আমার জীবনের সংযোগ স্থাপন করতে আজীবন চেষ্টা করব।"

শাশ্বত বাংলা-ভূমি ও শাশ্বত বাঙ্গালী

প্রত্যেক মানুষ তার জীবনকে পূর্ণ সফলতার দিকে চালিত করতে চায়। কিন্তু সেই সফলতা লাভ করবার জন্য যে মানুষ উৎসুক, সে যদি তার নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে তা হলে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, তার সফলতা যে কি প্রকারেব হবে সে সম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। বর্ত্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আমরা দেখি যে মানুষ কোন দেশেই জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পাচ্ছে না এবং তাতে করেই মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত ভাবে এবং জাতিগত ভাবে অনৈক্য, কলহ এবং সংগ্রামের উদ্ভব হয়ে বর্ত্তমান সভ্যতাকে এবং বর্ত্তমান জগতের মানুষকে ধ্বংসের পথে দ্রুত চালিত করছে। কেউ কেউ বলেন যে এর এক মাত্র প্রতিকার হচ্ছে মানুষকে বিশ্বমানবতার শিক্ষা দেওয়া—প্রত্যেক দেশের মানুষ—যাকে ইংরেজীতে বলে ন্যাশনেলিজম্ (national-ism) অর্থাৎ স্বদেশ-প্রেম—তার সঙ্কীর্ণতা ছেড়ে

দিয়ে একেবারে বিশ্বমানব-প্রেমে ভরপুর হয়ে ওঠলেই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হবে, নতুবা নয়। স্বদেশ প্রেমের যথার্থ আদর্শ ভুলে গিয়ে—এঁরা মনে করেন যে স্বদেশ-প্রেম মানুষকে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে—তার মনকে বিশ্ব-প্রেমে প্লাবিত হতে দেয় না; সুতরাং স্বদেশ-প্রেম যদি প্রত্যেক মানুষের মন থেকে একেবারে দূর করে দেওয়া হয় তবে তার মন প্রশস্ত হয়ে সার্ব্বভৌমিক প্রেমে ভরে উঠবে এবং সমস্ত পৃথিবীতে তা হলে শান্তি বিরাজ করবে।

এটা ঠিক যে, আজকাল ন্যাশনেলিজম (nationalism) অর্থাৎ স্বদেশ-প্রেমের নামে অনেক দেশেই মানুষের মনে সঙ্কীর্ণতা, অন্য দেশের মানবের প্রতি হিংসা এবং অন্য দেশকে গ্রাস করবার লোভ উপজাত হয়ে বর্ত্তমান জগতে অশান্তির, কলহের ও সংগ্রামের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এটা হয়েছে স্বদেশ-প্রেমের সত্য প্রকৃতির ধারণার অভাবে; তার সত্য প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের ও অনুভূতির অভাবে। এই দ্বন্দ্বের আর একটা কারণ, কোন কোন দেশের মানুষ মনে করে যে

তাদের দেশের সংস্কৃতি অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই অন্য-দেশ-ঘৃণামূলক মনোবৃত্তির ফলে এক দেশের লোক চায় অন্য দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর নিজের দেশের আধিপত্য বিস্তার করতে। এটা হয়েছে বর্ত্তমান যুগে মানুষের মনে অধ্যাত্ম আদর্শের অভাব এবং বস্তু-তান্ত্রিক আদর্শের প্রাবল্যের ফলে। এতে করেই বর্ত্তমান জগতে অশান্তি ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ব্রতচারী আদর্শ যে সকল মূলীভূত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, একমাত্র তাতে করেই বর্ত্তমান জগতের উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব। এই সংচেষ্টায় আছে বস্তু-তন্ত্রের চেয়ে অধ্যাত্ম আদর্শের শ্রেষ্ঠতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এবং জীবনে ভোগতান্ত্রিক আদর্শকে দূর করে জ্ঞান-শ্রম-সত্য-ঐক্য-আনন্দ-মূলক অধ্যাত্ম-আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার উপায় নির্দ্ধারণ। এটা হল মানুষের জীবনের লক্ষ্যের দিক থেকে ব্রতচারী সংচেষ্টার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ব্রতচারী সংচেষ্টার যে অন্য দিক, তাতে আছে স্বদেশ-প্রেমের সত্য প্রকৃতির নির্দ্দেশ এবং সত্যিকার স্বদেশ-প্রেমের উপর প্রত্যেক দেশের

মানুষের অন্তর্দৃষ্টি আকর্ষণ—প্রত্যেক দেশের মানুষের জীবন সমগ্রভাবে সংগঠিত করবার সত্য নির্দ্দেশ প্রদান।

স্বদেশ-প্রেমকে ব্রতচারী এক নূতন সংজ্ঞার উপর স্থাপিত করতে চায়, যাতে করে এক দেশের মানুষের মনে অন্য দেশের মানুষের প্রতি হিংসা বা দ্বেষের ভাব নির্ব্বাসন করে তার স্থানে এনে দেয় পরস্পর শ্রদ্ধার, অনুরাগের, সহযোগিতার এবং সমন্বয়-স্থাপনের আগ্রহ। ব্রতচারী সংচেষ্টার এই নূতন স্বদেশ-প্রেমের সংজ্ঞার মূলে আছে ছন্দবাদ এবং ভূমিবাদ। প্রত্যেক প্রাকৃতিক দেশ একটা বিশিষ্ট ভূমি। সেই ভূমির আকাশে বাতাসে জলে স্থলে নদীতে প্রান্তরে একটি বিশিষ্ট ছন্দ-স্রোতের ধারা প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হয়ে সেই দেশের মানুষকে একটা বৈশিষ্ট্য দান করে—তাদের চরিত্রে—তাদের ভাষায়—তাদের সাহিত্যে—তাদের কণ্ঠের স্বরে—তাদের গতি-ভঙ্গিতে—তাদের নৃত্যে ও গীতে একটা বৈশিষ্ট্যময় ভাব দান করে। জগতের প্রত্যেক বিশিষ্ট দেশে বা ভূমিতে এইরূপ একটি বিশিষ্ট ছন্দ-ধারা প্রবাহিত

হচ্ছে। এই ভূমিবাদ ও ছন্দবাদের সত্যকে মানুষ বর্ত্তমান জগতে অস্বীকার এবং উপেক্ষা করছে বলেই আজকাল প্রত্যেক দেশের মানুষের মন তাদের সত্য প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। তার ফলে তাদের অন্তরের অন্তস্তলে একটা গভীর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাতে করে আজকাল বিশ্বমানবের জীবন প্রতিদেশেই দ্বন্দ্বময় কলহময় অশান্তিময় হয়ে পড়েছে। যতদিন না প্রত্যেক দেশের মানুষ সেই দেশের ভূমির সত্য প্রকৃতির উপলব্ধি করতে পারবে এবং সেই ভূমির ছন্দধারার সঙ্গে নিজের জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করে সেই ভূমির ছন্দের পূর্ণ প্রকাশ-স্বরূপ হয়ে উঠতে পারবে, ততদিন মানুষের জীবন ছন্ন-ছাড়া, কৃত্রিম অস্বাভাবিক, ও অপূর্ণ থেকে যাবে —তত দিন বিশ্বে এক দেশের মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের দ্বন্দ্ব কলহ বিরাজ করবে। কিন্তু প্রত্যেক দেশের মানুষের জীবনে নিজস্ব ছন্দ-ধারার সংযোগ স্থাপন করতে পারলে এক দিকে আমরা পারব প্রত্যেক মানুষের জীবনে স্বভূমির প্রতি গভীর প্রেম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশের

ছন্দ-ধারার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বোধ জাগাতে; এবং তার ফলে অন্য ভূমির মানুষের প্রতি ঐক্যের ও প্রেমের ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

ব্রতচারী আদর্শে বিশ্ব-মানবের মনে প্রত্যেক ভূমির প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এনে মানুষের জীবনকে সকল দেশে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করে দিতে পারবে, এর ইঙ্গিত পাশ্চাত্য দেশের মনীষীরা এর মধ্যেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন ও স্বীকার করেছেন—বিশেষ করে স্বীকার করেছেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী ও কবি লরেন্স বিনিয়ন (Laurence Binyon)। তিনি বলেছেন "বর্ত্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবীতে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশে, আমরা জীবনের সমগ্রতাটি যেন হারিয়ে ফেলেছি —আমরা জীবন-ধারার সত্য রূপকে যেন হারিয়ে ফেলেছি; ব্রতচারী সংচেষ্টার উদ্দেশ্য—জীবনের এই সমগ্রতা এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই লুপ্ত সংযোগ পুনঃ স্থাপন করিয়ে দেওয়া।"

ব্রতচারী সংচেষ্টা প্রত্যেক দেশের মানুষের সঙ্গে তার ভূমির প্রকৃতির সংযোগ করে দিতে চায়। এটা প্রাদেশিকতা নয়—এটা সংকীর্ণ স্বদেশ-প্রেম

নয়, এটা মানুষের উৎপত্তির গভীরতম বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে সত্যটি সম্বন্ধে আজ-কালকার সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই, আজ-কালকার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদ্‌গণও অজ্ঞ।

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি— প্রতি দেশের মানুষ চায় নিজের জীবনে পূর্ণ সফলতা আনতে—কিন্তু তা করতে গেলে তাকে নিজের জীবনে আনতে হবে আত্মপরিচয়। "আত্মানং বিদ্ধি"—এটা শুধু সংস্কৃতে বলে না ; সব ধর্ম্মের মূলে 'know thyself" (নিজের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপন কর) এই আদেশ ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু মানুষ যে নিজের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে পারছে না,—তা হয়েছে তার জন্মভূমির সঙ্গে, তার মাতৃভূমির সঙ্গে, তার দেহমনের উৎপত্তির যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ, সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান জগতে সে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলে। প্রাচীন ভারতে এ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যের স্পষ্ট অনুভূতি যে ছিল এটা আমরা কয়েকটা কথায় সহজে বুঝিয়ে দেব। প্রথম কথাটা হচ্ছে 'ভূমিজ' শব্দ—যে কোন ভাল অভিধান খুলে দেখুন, 'ভূমিজ' শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে 'মানুষ'।

অর্থাৎ মানুষ তার ভূমি হ'তে উৎপন্ন, এটা একটা কেবল ভাবপ্রবণতার কথা নয়; শুধু ভাবপ্রবণতার বশে ভূমিকে 'মা' ডাকা হয় না। দেশে দেশে নিজ ভূমি হতে মানুষের দেহমন তৈরী হয়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে "Matrix" (ম্যাতৃক্স্); যে যে মৌলিক পদার্থ থেকে কোন জিনিষ উৎপন্ন বা তৈয়ি হয়, তাকে বলে সেই জিনিসের Matrix; অর্থাৎ যেমন যে মাটি থেকে কুম্ভকার তার কুম্ভ তৈরি করে, সেই মাটিটা হল কুম্ভের Matrix—এই Matrix-এর ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে 'মাতৃক'; অর্থাৎ যে পদার্থ থেকে কোন জিনিস উদ্ভূত বা তৈরি হয়, সেই পদার্থই হচ্ছে সেই উৎপন্ন জিনিসের মাতৃক। এটা আমার একটা মনগড়া কথা নয়; সংস্কৃত অভিধান খুলে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, 'মাতৃক' শব্দের অর্থ—উৎপত্তি-ভূমি অর্থাৎ উৎপত্তি-দায়ক পদার্থ। সুতরাং এই অর্থে প্রত্যেক মানুষের জননী তার মাতৃক—কিন্তু কেবলমাত্র জননী যে তার মাতৃক, তা নয়; তার জন্মভূমিও যে তার মাতৃক একথার আভাস আমরা পূর্ব্বে পেয়েছি 'ভূমিজ' কথা থেকে। সেই জন্যই আমাদের পূর্ব্ব

পুরুষেরা ঘোষণা করে গেছেন—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"; কেননা জননী ও জন্মভূমি উভয়েই আমাদের মাতৃক বা উৎপত্তি-ভূমি, তাদের অংশ নিয়েই আমাদের দেহমন তৈরি। তাদের অন্তর্নিহিত ছন্দ-ধারায় আমাদের দেহমন অনুছন্দিত ও নির্ম্মিত। শুধু হিন্দু ধর্ম্মেই এই সত্যের উপলব্ধি হয়েছিল তা নয়, ইছলাম ধর্ম্মেও এ কথাটার স্পষ্ট আভাস আমরা পাই—হদিসের বিখ্যাত কথায়—"হুব্ বুল্ ওতন্ মিন্ অল্ ঈমান্" অর্থাৎ স্ব ভূমির প্রতি প্রেম ধর্ম্মের একটা অঙ্গ। সুতরাং এতে করে আমরা পাচ্ছি যে, মানুষ যদি নিজের সত্য প্রকৃতিকে জানতে চায়, তা হলে সে যে মাতৃভূমি বা "মাতৃক" হতে উৎপন্ন, তার সত্যরূপ সর্ব্বপ্রথমে তাকে উপলব্ধি করতে হবে। সেই মাতৃক হতে উৎপত্তিকে তার ধর্ম্মের একটা অঙ্গ করে পবিত্র সত্যরূপে গ্রহণ করতে হবে।

এতে করে আমরা আরো পাচ্ছি যে, নিজেকে প্রকৃত ও সত্যভাবে চিনতে হলে প্রথমে চিনতে হবে নিজের ভূমির সত্য প্রকৃতিকে। বাঙ্গালী যদি নিজেকে প্রকৃতভাবে চিনতে চায়, নিজের প্রকৃতিকে যদি

চিনতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমে চিনতে হবে বাংলা ভূমিকে, বাংলা ভূমির প্রকৃতিকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালী বর্ত্তমান যুগে বাংলা ভূমির সত্য প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমার বিশ্বাস যে, একবার বাংলাভূমির সত্য প্রকৃতিকে চিনতে পারলে আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীর অন্তরের মধ্যে সেই ভূমির প্রতি এমন একটা প্রগাঢ় গৌরব এবং মমত্ব এনে দিতে পারব যাতে করে সেই গৌরবের মহিমায় ও সেই মমত্বের প্লাবনে সব বাঙ্গালী একপ্রাণ একমন হয়ে গিয়ে বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতে জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভিন্নতা ভুলে যাবে এবং এক অভিনব সখ্যে সম্মিলিত হবে। বাংলা ভূমির প্রকৃতির সেই সত্য রূপকে চিনিয়ে দেবার চেষ্টা আজ আমরা করব।

বাংলা ভূমি বিশাল ভারত ভূমির একটি অঙ্গ। এই বিশাল ভারত ভূমিতে একটি ঐক্যের গভীর ছন্দ-ধারা আবহমান কাল থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু এই ছন্দ-ধারার কেন্দ্র কোথায়, তার অনুভূতি বোধ হয় আমাদের অনেকেরই নেই। আমার মনে হয়, সেই ঐক্য-ধারার গঠন কেবল মাত্র যে

শাশ্বত বাংলা-ভূমি ও শাশ্বত বাঙ্গালী

এক দিকে উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত এবং অন্য দিকে সাগর-বেষ্টন দ্বারা হয়েছে—তা নয়। আমার মনে হয়—সেই ঐক্য-ধারার কেন্দ্র হিমালয়েব সুদূর উত্তর দেশে কৈলাস-পর্ব্বতেব সান্নিধ্যে মানস সরোবরের অন্তরতম তলদেশে। এই মানস সবোবর থেকে এক দিকে বেরিয়েছে শতদ্রু নদী এবং তাব উত্তর দিক থেকে বেরিয়েছে সিন্ধু নদী। এদের ধারায় তৈরি হয়েছে পঞ্চনদ দেশ। অপর দিকে এই মানস থেকে বেরিয়েছে ব্রহ্মপুত্রের সুদূব-প্রবাহী ধারা; এবং তার দক্ষিণে গঙ্গোত্রী হতে বেরিয়েছে গঙ্গানদীর আর্য্যাবর্ত্ত-পরিব্যাপ্ত ধারা-প্রবাহ। ভূমি-প্রকৃতির এই যে ঐক্যেব কেন্দ্র কৈলাস পর্ব্বত, গঙ্গোত্রী ও মানস সরোবরের দেশে—এটা ভারতের সংস্কৃতির ঐক্যের একটা গভীর প্রতীক।

কিন্তু ভারতভূমির কথা ছেড়ে দিয়ে বাংলা ভূমির সত্য প্রকৃতির কথা যদি ভেবে দেখি, তাহলে সমগ্র ভারতের ও সমস্ত জগতের মধ্যে বাংলাভূমি সত্য সত্যই যে কি অতুলনীয় ভূমি, তা আমরা বুঝতে পারব। বাংলাভূমির সত্য-প্রকৃতির রূপের

শাশ্বত বাংলা-ভূমি ও শাশ্বত বাঙ্গালী

এই অনুভূতি কয়েক দিন হল একটি জাগ্রত স্বপ্নের মত আমার মানস চক্ষে আবির্ভূত হয়ে তার অতুল সৌন্দর্য্যে, গরিমায় ও মহিমায় আমার মনকে ভরপুর করে তুলেছে। বাংলাভূমির সত্য-প্রকৃতির সেই ছবি আমি প্রত্যেক বাঙ্গালী নরনারীর, প্রত্যেক বাঙ্গালী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার, প্রত্যেক বাঙ্গালী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার, প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবক-যুবতীর, প্রত্যেক বাঙ্গালী শিশুর মনশ্চক্ষের সামনে এঁকে দিতে চাই; প্রত্যেক বাঙ্গালীর প্রাণের অন্তস্তলে তাকে স্থাপিত করতে চাই—তাহলে সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে বাংলাভূমি যে কত গৌরবময় উপাদান দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে—আমাদের মাতৃভূমির ও "মাতৃকে"র প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য যে কত অতুলনীয়, তা উপলব্ধি করতে আমরা পারব এবং তা হলে আমরা বাংলার স্ব-ছন্দ-ধারার প্রবাহ আমাদের জীবনে আবার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আকুল আগ্রহবান হব।

বাংলাভূমির যে ছবি আমরা সাধারণত আঁকি, যে মানচিত্র সাধারণত স্কুলে আমাদের ছেলেমেয়েদের শেখান হয়, সেটা একটা অতি সঙ্কীর্ণ, অতি অসম্পূর্ণ, অতিমাত্র আংশিক খণ্ড-বিখণ্ডিত

বাংলা। রাষ্ট্রীয় পরিচালনার সুবিধা-অসুবিধার হিসাব-ব্যবস্থায় বাংলাভূমির যে বাটোয়ারা হয়েছে, তার সঙ্গে বাংলার ভূমিগত এবং প্রকৃতিগত সত্তার সম্পূর্ণ অমিল হয়েছে। যে বাংলাভূমিব কথা আমরা আজকালকার বইতে স্কুলে পড়ি, তা এই রাষ্ট্রীয় বাটোয়ারা-প্রসূত—বিখণ্ডিত এবং আংশিক একটা ভূমিখণ্ড মাত্র। কিন্তু বাংলাভূমির ছন্দগত এবং প্রকৃতিগত একটা নিজস্ব সত্তা আছে যেটা বিশ্ব প্রকৃতির ছন্দ-প্রসূত—যেটা শাশ্বত ভাবে রাষ্ট্রীয় বাটোয়ারার ভাগাভাগির বহু উর্দ্ধে এবং এই ভাগাভাগি যাকে বিনষ্ট করতে পারে না এবং পারবে না। সেই বিশ্ব-প্রাকৃতিক বাংলাভূমিকে আমাদের চিনতে হবে। সেই বিশ্বপ্রাকৃতিক বাংলার একটা সহজ সংজ্ঞাস্বরূপ আমরা বলতে পারি, যে ভূমির ছন্দে ছন্দে তার অধিবাসীর অন্তরে বাংলা ছন্দ তৈরি হয়, কণ্ঠে বাংলা ভাষা নির্গত হয়, সেই ভূমিই বাংলা ভূমি। এই অর্থে এখন বাংলার বাইরে অনেক জেলা আছে যেগুলি এই বিশ্ব-প্রকৃতিগত সত্তা বাংলাভূমির অবিচ্ছিন্ন অংশ; যথা—পুর্ণিয়া জেলা, মানভূম জেলা, সিংহভূম, হাজারিবাগ,

রাঁচি ইত্যাদি ছোটনাগপুরের প্রদেশ; এবং পূর্ব্বদিকে কাছাড়, শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বাংলা-ভাষী প্রদেশ। এই প্রাকৃতিক বাংলা ভূমির সমগ্র সত্তাকে রাষ্ট্রীয় খণ্ড-বিখণ্ডের মধ্যেও আমাদের প্রতিমুহূর্ত্ত স্মরণ রাখতে হবে এবং সেই বৃহৎ বঙ্গ-ভূমির ছন্দধারাকে এই সমগ্র ভূমির মানুষের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও জয়যুক্ত করে বিশ্বে তার অতুলনীয় অবদান প্রদান করাবার জন্য সাধনা করতে হবে। এতে করে হবে বিশ্বে বাঙ্গালীর সার্থকতা ও মূল্য। কিন্তু এই যে বাঙ্গলা-ভাষা-নির্ম্মাত্রী প্রকৃতি, যেটি আমাদের দেহ মনের "মাতৃক", এই যে আমাদের সোনার বাংলা ভূমি, এর প্রকৃতি এবং এর ছন্দ-ধারার গরিমা এবং মহিমা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হলে আমাদের খুঁজতে হবে তার শক্তির উৎপত্তির উৎস-ধারাগুলিকে। বিশ্ব-প্রকৃতির বিধানে যে সব উৎস-ধারার স্রোতে এই সোনার বাংলা ভূমি অনুপ্রাণিত ও অনুছন্দিত, সেই উৎস-ধারাগুলির সন্ধান নিয়ে বাংলা ভূমির পূর্ণ রূপকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। সেই সন্ধান নিতে গেলে আমরা কি পাই?—পাই এক অনুপম অনির্ব্বচনীয়

রূপ, যা সমগ্র জগতের মধ্যে অতুলনীয়। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির উচ্চতম উৎস-ধারার সংযোগে, সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠতম ধারাপ্রবাহের সাধনায়, আমাদেব এই সোনার বাংলা ভূমির সৃষ্টি হয়েছে, এটা বাস্তব সত্য, এটা প্রাকৃতিক সত্য।

সুদূর মানস সবোবর থেকে উদ্ভূত হয়ে ব্রহ্মপুত্র-নদের ধারা এসেছে বাংলাকে গঠিত, অনুচ্ছন্দিত ও অনুপ্রাণিত করবাব জন্যে—তার জন্য তাব ধাবা এসেছে হিমালয়েব সুদৃঢ় প্রাচীরকে ভেঙ্গে অপ্রতিহত বেগেব আবেগে; এই দেশকে অনুচ্ছন্দিত করবাব জন্যে ছুটেছে—গঙ্গা, সুদূব গঙ্গোত্রী-শিখর থেকে—বদরীনাথেব ও নন্দাদেবীর উত্তুঙ্গ শৃঙ্গতল থেকে। অপব দিকে, একদিকে গঙ্গার ধারার সঙ্গে তাকে বর্দ্ধিত কবেছে—হিমালয়ের শৃঙ্গদেশ থেকে নির্গত ঘর্ঘবা, গণ্ডক প্রভৃতি নদী, আবার অপর দিকে এই গঙ্গাধাবাব সঙ্গে যোগ দিয়েছে হিমালয় থেকে নির্গত যমুনার ধারা এবং আরাবলী ও বিন্ধ্য পর্ব্বতরাজি থেকে নির্গত বনগঙ্গা, বানস, পার্ব্বতী, চম্বল, বেতুয়া ও শোননদের ধারা। এগুলি বাংলার বাহিবে বটে,

কিন্তু এদের ধারা গঙ্গাধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলা ভূমিতে এসে পরিণতি লাভের জন্য চিরন্তন কাল থেকে ধাবিত হচ্ছে। তাদের ধারার সাধনার পরিণতি বাংলা ভূমিতেই সংসাধিত হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গাধারার মহামিলনে আমাদের সোনার বাংলা ভূমির গঠন; কিন্তু তার সঙ্গে যোগ হয়েছে এমন আরও কয়েকটি ধারার—যেগুলি বাংলার সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং যেগুলি বিশ্ব-প্রকৃতি কেবল বাংলাকে গঠন করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই বিশিষ্ট ধারাগুলির উৎপত্তি হয়েছে হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ সুমেরু (Everest) শিখর, গৌরীশঙ্কর ও কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গ দেশ হতে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তুঙ্গ এই যে বিশাল সুমেরু (Everest) ও কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ, তাদের পাদদেশধৌত সলিল-ধারার মানচিত্র দেখলে কোন সন্দেহ থাকে না যে, এগুলি তৈরি হয়েছে বাংলা ভূমির গঠনের ও অনুপ্রেরণার জন্য। পূর্ণিয়ার পশ্চিমবাহী কুশী (কৌশিকী) নদীর বহু-বিস্তৃত উৎপত্তি-ধারাগুলি এভারেষ্ট ও গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গের পাদদেশ বেষ্টন করে তাদের শৃঙ্গদেশ-নির্গত তুষারকণা থেকে

নিস্থত প্রতি জলবিন্দুকে বাংলা দেশকে গঠন করবার জন্যে বহন করে প্রধাবিত করে আসছে। তেমনি ত্রিস্রোতা (তিস্তা) নদী আসছে—কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশ বেষ্টন করে, কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরের তুষার-কণা হতে নিস্থত জলবিন্দু-ধারাগুলিকে বাংলা-দেশকে গঠনের জন্য প্রধাবিত ও প্রবাহিত করে। কুশী নদী এবং তার শাখা তিলযোগা নদী যে বাংলার প্রকৃত পশ্চিম সীমান্ত, তার প্রমাণ আমরা পাই "দ্বারভাঙ্গা" জেলার নামটী থেকে। এই দ্বারভাঙ্গা জেলাটী কুশী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত এবং ইহা "দ্বারবঙ্গ" কথারই অপভ্রংশ। এই 'দ্বারবঙ্গ' নাম থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে, এই প্রদেশই প্রাকৃতিক বাংলা ভূমির পশ্চিম "দ্বার"-স্বরূপ। এই দ্বারবঙ্গের পূর্ব্ব সীমানা থেকে অর্থাৎ কুশী নদীর ধারা থেকে বাংলা ভূমির আরম্ভ। পশ্চিম দিকে বিন্ধ্য পর্ব্বতশ্রেণীর পূর্ব্ব প্রান্ত থেকে, ও মন্দার পর্ব্বতের তলদেশ হতে সুবর্ণরেখা, রূপনারায়ণ, দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি স্রোতস্বতী প্রধাবিত হয়েছে পশ্চিম বাংলাকে গঠন করতে। আর পূর্ব্ব দিকে সুরমা,

কুশিযাবা, ববাক, মেঘনা, ফেনী, ও কর্ণফুলীব ধাবা, জয়ন্তী পর্ব্বত ও ব'ঙ্গামাটিব পর্ব্বতবাজি থেকে নির্গত হয়ে বাংলা ভূমিব কাছাড, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুবা প্রভৃতি দেশকে গঠন কববাব জন্য প্রধাবিত হয়ে আসছে। নদীমাতৃক আমাদের এই সোনাব বাংলা ভূমিব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেব তুলনা অন্য কোন দেশে নেই। বাংলা ভূমিব সত্যিকাব প্রাকৃতিক মানচিত্র দেখলে সে বিষযে কোন সন্দেহ থাকতে পাবে না। বহু নদীব তবঙ্গ-ছন্দে অনুছন্দিত এই বাংলা ভূমি-প্রসূত যে মানুষ, তার জীবনেব অন্তস্তলে যে একটা অতুলনীয ছন্দ-ধাবা প্রবাহিত হবে, সে আশ্চর্য্যেব কথা নয়; এবং তাব বাস্তব প্রমাণ আমবা পাই বাংলার ইতিহাসে, বাংলার সত্য-প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষেব প্রকৃতিগত বিশিষ্ট্যে, তাদেব ছন্দশক্তির অতুলনীয় প্রতিভায়, তাদেব অধ্যাত্ম শক্তিব মহিমায়—চৈতন্য, জয়দেব, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, কবি দৌলত কাজী, আলোয়াল, শাহজ-লাল, রামমোহন রায়, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মহিমময় ছন্দপ্রতিভা ও অধ্যাত্ম শক্তির বিকাশ

একমাত্র এই নদীতরঙ্গমাতৃক বাংলা ভূমিতেই সম্ভব।

বাঙ্গালী যদি তার স্বভূমির এই প্রকৃত রূপের সন্ধান অন্তরে আনতে না পারে, তার স্বরূপ মানসচক্ষে প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করতে না পারে, তবে সে তার নিজের সত্য স্বরূপ ও প্রকৃতির উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হবে। ব্রতচারী চায় প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢা, বালক বালিকাকে বাংলার এই অতুলনীয় নদীমাতৃক, ছন্দমাতৃক রূপের সন্ধান এনে দিতে, যাতে করে সে তার এই মাতৃভূমিব, তার প্রাকৃতিক মাতৃকের, সত্য প্রকৃতির গৌরব বোধ করতে পারবে; এবং তাব মহিমায় তার নিজের অন্তরে এমনি একটা বিশিষ্ট গৌরব বোধ করতে পারবে, যার দ্বারা বিশ্বে তাব বিশিষ্ট অবদানের গৌরব-বোধ তার অন্তরে প্রতিনিয়ত জাগবে। সে অবদান বস্তুতান্ত্রিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠভাবে পরিস্ফুট হয় না—সে অবদান পরিস্ফুট হবে বাংলার স্ব-ভাবের, স্ব-ছন্দের, স্ব-প্রকৃতির দানে, যে দান বিশ্বে অনন্তকাল তার প্রভাব জাগিয়ে রাখবে, যে দান কেবল বাঙ্গালীই দিতে পারবে,

যা অন্য ভূমির লোকদের দেওয়া অসম্ভব। সেই জন্য আমি আমার "বাংলা ভূমির দান" শীর্ষক গানে এই ভূমি-বোধ প্রত্যেক বাঙ্গালীব প্রাণে জাগিয়ে দেবার জন্যে লিখেছি—

"আমবা বাঙ্গালী, সবাই বাংলা মা'র সন্তান—
বাংলা ভূমির জল ও হাওয়ায় তৈরি মোদের প্রাণ।
মোদেব দেহ, মোদের ভাষা, মোদের নাচ আব গান
বাংলা ভূমির মাটি হাওয়া জলেতে নির্ম্মাণ।
বাংলা ভূমির প্রেমে মোদের ধর্ম্ম আর ইমান্—
বাংলা ভূমি মোদের কাছে স্বর্গ-সমান স্থান।
বাংলা ভূমির ছন্দ-ধারার পালন করে মান—
দান্ব মোরা বিশ্বে মোদের বিশিষ্ট-তম দান।"

আর সেই জন্য "মাতৃ-ভুমি" নামক আমার রচিত গানে আমি বলেছি—"বাংলা বিশাল বিশ্বে বিধির স্নেহের অতুল দান।"

বাংলা ভূমির এই বিশ্ব-প্রকৃতিগত সত্য রূপ, যা আমার মনে তার গভীর ছাপ দিয়েছে এবং যা আমাকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করছে, তার সন্ধান আমি প্রত্যেক বাঙ্গালীকে দেবার জন্য ব্যাকুল। সেই ব্যাকুলতার আবেগে

শাশ্বত বাংলা-ভূমি ও শাশ্বত বাঙ্গালী

সম্প্রতি কয়েক দিন হল যে ভাবধারা ছন্দরূপ গ্রহণ করে আমার অন্তরের অন্তরতম তলদেশ থেকে নির্গত হয়েছে, সেই 'শাশ্বত বাংলা ও শাশ্বত বাঙ্গালী' শীর্ষক গানটী এই বইয়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

আমি কামনা করি, যেন এই গানের ভাব প্রত্যেক বাঙ্গালীর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কণ্ঠের লীলায়িত ছন্দে প্রকাশিত হয়। তাতে এক দিকে বাংলাভূমির অতুলনীয় মহিমার উপলব্ধি দেবে, অপর দিকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে এক সুগভীর ভূমিপ্রেমের ঐক্য-সূত্রে চির-গ্রথিত করবে, এবং তা হলেই আমার এই শাশ্বত বাংলার জাগ্রত-স্বপ্নের সফলতা সাধিত হবে।

শা-শ্ব-বা

(শাশ্বত বাংলা ও শাশ্বত বাঙ্গালী)

চন্দ্র সূর্য্য তারায় ভরা
ব্যোম-ঘেরা এই বিশাল ধরা—
মোদের সোনার বাংলা ভূমি শোভে তাহার মাঝে—
ব্রহ্মপুত্র তিস্তা কুশী গঙ্গাধারার সাজে ॥

হিমাচলের শিখর-স্রোতের
মানস-সরের সুদূর-ব্রতের
এই ভূমিতেই হয় অতুলন মিলন-পরিণতি—
এই ভূমিতেই বয় অনুপম পদ্মা মধুমতী ॥

বিন্ধ্যগিরির বিন্দু বারির
আরাবল্লীর উৎস সারির
যুক্ত ধারার মুক্ত প্রসার শতেক বাহু মেলে'
এই ভূমিতেই নিত্য নূতন সৃষ্টি প্রলয় খেলে ॥

রূপনারায়ণ মেঘনা ফেণী
করতোয়া আর ত্রিবেণী—
এই ভূমিকেই সিক্ত করে' ধায় সাগরের পানে—
এই ভূমি বিধৌত প্রবল দামোদরের বানে ॥

কীর্ত্তনীয়া বাউল গাজি
ভাটিয়াল আর সারির মাঝি
এই ভূমিতেই অন্ত-বিহীন জ্ঞানের গভীর বাণী
সহজ কথায় নৃত্যে সুরে দেয় জীবনে আনি ॥

যুগে যুগে রণ-ভূমে ধায়
রায়বেঁশে আর ঢালি হেথায়—
হিন্দু-মুসলমানের প্রাণের মিলন-নিঝরিণী—
জাগায় এই ভূমিতেই বাংলা ভাষায় মধুর প্রতিধ্বনি ॥

(কোরাস্) এই ভূমির অনন্ত দানের বিশ্বেতে দীপালি—
দিব সন্ততি এই স্বর্ণ-ভূমির সুধন্য বাঙ্গালী—
মোরা সুধন্য বাঙ্গালী—
মোরা সুধন্য বাঙ্গালী ॥

শাশ্বত বাঙ্গালীর প্রেরক্ষণ

আমাকে যদি এক কথায় ব্রতচারী সংচেষ্টার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে কেউ বলে, তা হলে আমি বলব—এর উদ্দেশ্য, ব্রতচারীর পঞ্চব্রত অর্থাৎ জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য, আনন্দ—এই পঞ্চবিধ পরিপূর্ণ আদর্শের একাধারে বিকাশ করে বিশ্বমানবের জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করতে সাহায্য করা। এই অর্থে ব্রতচারী সংচেষ্টা সার্ব্বজনীন এবং সার্ব্বভৌমিক। কিন্তু ব্রতচারীর বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মতে বিশ্বমানবের জীবনে চরম সার্থকতা আনা ততক্ষণ অসম্ভব, যতক্ষণ না প্রত্যেক বিভিন্ন ভূমি-জাত মানুষ তাদের আপন আপন ভূমির বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিধারার পূর্ণ বিকাশ করতে পারবে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্রতচারী সংচেষ্টা একাধারে সার্ব্বভৌমিকতাবাদী ও নিবিড়-ভাবে জাতীয়তাবাদী। বিশ্বমানবের পরিপূর্ণতার

আদর্শকে ব্রতচারী সমন্বিত করতে চায় প্রত্যেক ভূমির সংস্কৃতির ক্রমধারার সঙ্গে। ব্রতচারী চায় প্রত্যেক জাতিকে তার নিজস্ব সংস্কৃতি-ধারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়ে দিতে।

বর্ত্তমান সময়ে বাংলাদেশের মানুষ এমন একটা যুগ-সন্ধিস্থলে এসে পড়েছে, যেখানে তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য ব্রতচারী আদর্শের বাণী বিশেষ প্রয়োজন। আজকাল আমরা যে যুগে এসে পড়েছি, তথাকথিত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক একে সসম্ভ্রমে বলেন 'অধুনাতন' অর্থাৎ 'মডার্ণ' যুগ। তাঁরা এই অর্থে বলেন, যেন এটা এমন একটা অভিনব ও উন্নত আদর্শ এনে দিচ্ছে, যা ছিল অতীত যুগের মানুষের কল্পনার একেবারে বাইরে এবং তাদের আদর্শের অনেক উচ্চে। আর কেবল তা-ই নয়, তাঁদের মতে অতীত যুগের আদর্শ থেকে যত বেশী অমিল ঘটে, আধুনিকতার ততই বেশী প্রগতি ও বাহাদুরী। এই ধারণার ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে, আজকাল পাশ্চাত্য দেশের দেখাদেখি বাংলার এবং ভারতের যুবক যুবতীরা ও শিক্ষিতেরা আপন দেশের যা কিছু প্রাচীন ধারা তাকে নেহাৎ

সেকেলে ও অনাধুনিক বলে তাচ্ছিল্যেব ভরে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করে অতি-আধুনিক যৌন সাহিত্য থেকে এবং অতি-আধুনিক সিনেমা, রেডিও ও অন্যান্য যান্ত্রিক প্রণালীর অভিপ্রদর্শন থেকে লব্ধ নতুন নতুন কায়দার প্রবর্ত্তন করে দেশের মাটি ও দেশের ধারা ছেড়ে এক লাফে তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে ঝাঁপিয়ে একেবারে অতি নূতনত্বের পথে গিয়ে অতি-আধুনিক বা 'মডার্ণ' বলে পবিচিত হবাব জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র। তার ফলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, অন্যান্য দেশের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মানুষও আপন আপন ভূমিগত সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একেবারে যন্ত্রনির্ম্মিত এক-ছাঁচে গড়া কারখানার মাল হয়ে উঠছে। এবং এটাকে সভ্যতার চরম পরিণতি বলে গণ্য করা হচ্ছে।

ব্রতচারী সংচেষ্টা চায়, বাঙ্গালী নরনারীকে বুঝিয়ে দিতে যে, শিক্ষিত-সাধারণের মধ্যে সভ্যতার ও উন্নতির এই যে আধুনিকতার আদর্শ, ইহা মূঢ়তা-প্রসূত এবং ভ্রান্তিমূলক। এই আদর্শবাদের আমদানী মূলতঃ আমেরিকা থেকে। আমেরিকার

এই আধুনিকতা-আদর্শ-রাক্ষসী প্রথমে ধীরে ধীরে ইউবোপেব জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এখন ইউরোপেব নানা জাতির আপন আপন বৈশিষ্ট্যমূলক বহুমূল্য যে প্রাচীন সংকৃষ্টিধারা ছিল সেগুলোকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। এটা ইউরোপের সুধীগণ আজ বুঝতে পেরেছেন এবং বুঝতে পেরে হাহাকার করছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাক্ষসী ইউরোপের সংকৃষ্টিধারাগুলো এতদূব গ্রাস করে ফেলেছে, যে এর হাত থেকে তাদেব রক্ষা পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ইউরোপের সুধীগণ তাই ভারতবর্ষের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছেন—ভারতবর্ষ যে অতি প্রাচীন সংস্থতি-ধারাকে সনাতনকাল থেকে অতি যত্নে লালন করে আসছে, তার সঞ্জীবনীধাবা থেকে তাঁরা হয়ত নিজের নিজের লুপ্তপ্রায় সংস্থতি-ধারাকে আবার সঞ্জীবিত্ করতে পারবেন, এই আশায়। কিন্তু সেই রাক্ষসী ইতিমধ্যেই ভীষণ-বেশে এসেছে, তার বাহ্যিক চাকচিক্যের মোহ নিয়ে ভারতবর্ষের সংস্থতিধারাকে গ্রাস করতে। এবং আমরা বাংলা ও ভারতের যুবক-যুবতী ও

শিক্ষিতগণ তার বাহ্যিক চাকচিক্যে মোহগ্রস্ত হয়ে আমাদের সর্ব্ব'স্ব'কে—আমাদের জাতীয় জীবনের মূলীভূত বৈশিষ্ট্যময় যাবতীয় স্বধারাকে বিসর্জ্জন দিয়ে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছি। এরকম আরো পাঁচ-দশ বছর চললে বাঙ্গালী ও ভারতের অন্যান্য জাত যে তাদের প্রাচীন সমগ্র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে ইউরোপ আমেরিকার ছাঁচে-ঢালা একঘেয়ে কলের মানুষ হয়ে পড়বে, তাতে সন্দেহ নেই।

আমেরিকার পক্ষে এই অতি-আধুনিকতা সাজে—কারণ তার নিজস্ব ধারা কিছু ছিল না। তাই তার অন্তরের শূন্যতা ও নিঃ'স্ব'তার দৈন্য ঢাকতে গিয়ে সে এই অতি-আধুনিকতার সৃষ্টি করেছে। তার আর অন্য কোন পথ ছিল না এবং এর ফলে তার কিছু ক্ষতি হয় নি,—কারণ যন্ত্র ও যন্ত্রজাত জিনিস ছাড়া বিশ্বে তার কোন অবদান ছিল না। অর্থাৎ জাতির অন্তরের গভীর ক্রম-ধারার যে কত বড় মূল্য তা আমেরিকা জানে না—তা জানবার তার কোন সুযোগ হয়নি। এবং বিশ্বের জীবনে কোন জাতির মূল্য যে

কেবলমাত্র তার অন্তরের ক্রমধারার বৈশিষ্ট্যের অবদান, এটা আমেরিকার বুঝবার কখনো সুযোগ হয়নি। আমেরিকার আধুনিকতা-রাক্ষসীর মোহে যারা মুগ্ধ, তারাও বিশ্ব-সৃষ্টির মূলীভূত এই সত্যের অনুভব করতে অক্ষম। কিন্তু ভারতের মানুষ—বিশেষ করে বাংলার মানুষ—যদি এই সত্যকে আজ অনুভব করতে অক্ষম হয়, তা হলে হয়ত আমরা অচিরে আমেরিকার চেয়েও বড় যান্ত্রিক জাত হয়ে উঠতে পারি—অর্থের দিক দিক দিয়ে ও বস্তু-সমৃদ্ধির দিক দিয়ে—কিন্তু বাংলার শাশ্বত ভূমিগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যধারা হারিয়ে বিশ্বমানবের আসরে আমাদের দান করবার কোন কিছু থাকবে না। এবং ভবিষ্যৎ যুগে যখন বিশ্বমানুষ সভ্যতার প্রকৃত অর্থ বুঝবে, তখন আমরা মিশর ও গ্রীসের মতো স্ব-সংকৃষ্টি-চ্যুত হয়ে নিঃস্ব ও দীনরূপে তাদের চোখে প্রতিভাত হব। একবার আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিধারার সঙ্গে যোগ লুপ্ত হলে আবার তাকে জাতির জীবনে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হবে।

ব্রতচারীর মূলতত্ত্ব ভূমিবাদ ও ছন্দবাদের উপর

প্রতিষ্ঠিত। তাই ব্রতচারী বিশ্বাস করে, বাংলার স্বধারার একটা শাশ্বত রূপ আছে। একটা নদী যেমন পর্ব্বত-শৃঙ্গ হতে ক্ষীণধারায় উৎপত্তিলাভ করে' শাখা-প্রশাখার দ্বারা ক্রম-বর্দ্ধিত হয়ে তার নিজেব প্রবাহের একটা বিশিষ্টরূপ ধারণ করে' তার নিজস্ব একটা পথ খনন করে' অনন্ত সাগরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য চিরধাবিত হয়, ব্রতচারীর মতে প্রত্যেক ভূমিজাত জাতির জীবনধারা ইহারই অনুরূপ একটি ক্রম-প্রবাহিত সংস্কৃতি-ধারা। কোন এক বিশেষ মুহূর্ত্তে নদীপ্রবাহে যে বিশিষ্ট জল-বিন্দুগুলি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের সেই নদীর সত্তায় চিরস্থায়িত্ব নেই ; তারা চলে যাচ্ছে সমুদ্রে। কিন্তু তাদের জায়গায় অনন্তকাল অন্যান্য জলবিন্দু এসে সেই ধারার সংস্থিতিকে অব্যাহত রাখছে। সেই সংস্থিতিকে অব্যাহত রাখাই নদীর প্রবাহের জলবিন্দুগুলির সার্থকতা। কিন্তু সেই ধারাকে সম্পূর্ণ অব্যাহত ও বেগবান রাখতে হলে, নদীর আগাগোড়া-প্রবাহিত প্রত্যেক জলবিন্দুকে তার সুদূর উৎপত্তি-ভূমি হতে নিঃসৃত সংস্থিতি-ধারার ঠেলা ও তার সঙ্গে ধারাবাহিক সংযোগ অনুভব

করতে হবে। সেই ঠেলা এবং ধারাবাহিক সংযোগ অনুভব করতে না পারলে জলবিন্দুগুলি নদীর ক্রম-প্রবাহিত রূপ ও বেগবত্তা হারিয়ে তার নদীত্ব থেকে চ্যুত হবে এবং কয়েকটি স্রোতহীন বিচ্ছিন্ন পঙ্কিল ব্যাধিকর জলকুণ্ডে পরিণত হবে। একটি জাতির জীবনও ঠিক সেই রূপ। আধুনিকতাব মোহে জাতির জীবনধাবার কোন একটি যুগে তার ব্যক্তি-গুলি যদি জাতির আদিম উৎপত্তি হতে নিঃসৃত ক্রম-সংস্থিতি-ধারাকে অবহেলা করে'—তুচ্ছ করে'—তার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তা'হ'লে সেই ধারাবাহিকতাব ঠেলা ও সংযোগ হারিয়ে জাতির জীবন-ধারার বেগবত্তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং জাতির জীবন তার ধারাবাহিকতাব বৈশিষ্ট্যময় স্রোত হারিয়ে দিশাহীন লক্ষ্যহীন কয়েকটি বিশ্লিষ্ট স্থিতিশীল পঙ্কিল ব্যাধিময় কুণ্ডে পরিণত হয়। যে জাতি তার উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্যধাবাগুলিকে ঘৃণা করে, এবং সেগুলির সঙ্গে সংযোগ পরিহার করবার জন্য ব্যগ্র হয়, যে জাতির মহিলারা মা-ঠাকুরমাদের এবং পুরুষরা বাপ-দাদাদেব চরিত্রের গভীরতম আদর্শ এবং জীবন-প্রণালীর সহজ সরল বৈশিষ্ট্যময়

ছন্দপ্রকাশের ধারাকে ঘৃণাভরে অস্বীকার ও পরিহার করে' থিয়েটার, সিনেমা ও বিদেশের আমদানী অতি আধুনিক যৌনসাহিত্যলব্ধ সম্পূর্ণ বিসদৃশ আদর্শ গ্রহণ করবার জন্য লালায়িত এবং সেটাকেই সভ্যতার চরম পরিণতি বলে বিশ্বাস করে তৃপ্ত, সে যে মরা নদীর মত বেগশূন্য ও বৈশিষ্ট্য-শূন্য হয়ে একটি বিশিষ্ট জাতি হিসাবে তার অস্তিত্ব হারাবে, এবং তার ব্যক্তিগণ একটি বিশিষ্ট জাতির স্বভাব ও স্বচ্ছন্দ-ধারা হারিয়ে বিশ্বের কাছে মূল্যহীন ঘৃণিত ভারস্বরূপ হয়ে থাকবে, তা নিঃসন্দেহ।

ব্রতচারী তাই প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়েকে বলতে চায়, তোমাদের মা-ঠাকুরমাদের চিরাগত জীবন-প্রণালী—যা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ নয়, তাকে কেবল মাত্র সেকেলে বলে পরিহার কোরো না। কেন না এই সহ-জ প্রণালীগুলি জাতির সংস্কৃতিধারার ধারাবাহিকত্বের বাহকস্বরূপ। এগুলি পরিহার করলে আধুনিকযুগের বাঙ্গালী মেয়েরা বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্যকে লোপ করবার অপরাধে—কেবল ভবিষ্যৎ-যুগের বাঙ্গালার কাছে নয়, সমগ্র বিশ্বের কাছে অপরাধী হয়ে থাকবে। আর বাঙ্গালী পুরুষদেরও

বলি, বাপ-দাদার চিরাগত জীবন-প্রণালীর মূলীভূত ধারাগুলিকে যদি আমরা রক্ষা না করি, তা হলে আমরাও ঐরূপ অপরাধে অপরাধী হব।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষিতগণ—বিশেষতঃ যুবকগণ—এটাকে হয়ত বর্ব্বরতা বা সেকেলে কথা বলে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁরা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে এটা কেবল আমার কথা নয়—ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী, যিনি আধুনিকতার অগ্রদূত বলে যুবক-যুবতী সমাজে স্বীকৃত—সেই হ্যাভলক এলিস (Havelock Ellis) বলেছেন—

What the race lives by is its traditions, its power of embodying the finest emanation of its spirit and flesh in forms of undying beauty and aspiration which are never twice the same. It is these traditions which are the immortal joy of Mankind, and in their destruction the race is far more hopelessly impoverished than in the destruction of any number of human beings; for it is by his traditions that Man is Man, and not by the number of meaningless

superfluous millions whom he spawns over the earth.

তাৎপর্য্য—

জাতি বাঁচে তার নিজস্ব সংস্কৃতি ধারার মধ্যে—যেগুলি তার আত্মার ও দেহের আরাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশের অমর সৌন্দর্য্যময় স্বরূপ— এবং যেগুলি প্রতিনিয়ত নূতন নূতন আকারে তার জীবন থেকে প্রকাশ পায়। বিভিন্ন জাতির এই ক্রম-সংস্কৃতি ধারাগুলিই বিশ্বমানবের শাশ্বত আনন্দ-সম্পদ, আর, সেই সংস্কৃতি-ধারাগুলির বিনাশে সমগ্র মানব জাতি যে গভীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়—সে ক্ষতি সহস্র সহস্র ব্যক্তির বিনাশের চেয়েও বেশী। কারণ, মানুষের মনুষ্যত্ব একমাত্র তার জাতিগত সংস্কৃতি-ধারায়—তার বংশ-প্রসূত অর্থহীন আদর্শহীন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির সংখ্যা-বাহুল্যে নয়।

সুতরাং বাঙ্গালী বুঝুক, যে তার মা-ঠাকুরমার যে-সব ব্রতপ্রণালী ও যে-সব সহজ সরল জীবনধারা এবং বিশেষ করে বাংলার নারী-জীবনের আত্ম-প্রকাশমূলক ব্রত-নৃত্য-প্রণালী এখনও সুদূর গ্রামে গ্রামে অবশিষ্ট আছে সেগুলির মূল্য, এবং যে সব মেয়েরা সেগুলি এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁদের জীবনের আদর্শের মূল্য, বাংলার বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কলপ্রসূত স্বধারা-চ্যুত সহস্র সহস্র গ্রাজুয়েট মেয়েদের জীবনের মূল্যের চেয়ে অনেক

বেশী। বাংলার গ্রামে গ্রামে বাঙ্গালী জাতির শৌর্য্যবীর্য্যের, ধর্ম্ম-প্রাণতার ও সহজ আনন্দের সংস্কৃতি-ধারামূলক বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালীর অবজ্ঞাত রায়-বেঁশে নৃত্য, ঢালি নৃত্য, জারী নৃত্য, কীর্ত্তন নৃত্য ইত্যাদি জাতীয় সংকৃষ্টি-ধাবার, এবং তাদের বাহক নিরক্ষব ও গরীব পল্লী-বাসীগণেব জীবনের মূল্য, সংস্কৃতি-ধাবা-চ্যুত বিদ্যালয়ের শত সহস্র গ্রাজুয়েটের জীবনেব মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী। জাতিব এই আবহমান সংস্কৃতি-ধারাগুলোকে যদি আমরা অবহেলা কবি ও বক্ষা না করি—উচ্ছৃঙ্খল 'প্রগতি'র ভ্রান্ত আদর্শেব মোহে পড়ে যদি 'প্ররক্ষণের' মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা ভুলে যাই, তা হলে বাঙ্গালী জাতিব যা কিছু সংস্কৃতি-ধাবা এখনও অবশিষ্ট আছে, সেগুলোকে চিরতরে হারিয়ে বাঙ্গালীকে জাতি হিসাবে শাশ্বত কাল নিঃস্ব ও নিরর্থক কববার অপরাধে আমরা বিশ্বের দরবারে অপরাধী হয়ে থাকব। আমি তাই বাংলার শিক্ষিত সমাজকে আহ্বান ও অনুরোধ করি যে, প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যেন বাংলার আবহমান জীবন-ধারার এই

শাশ্বত ছন্দ-রূপগুলিকে প্রত্যেক বাঙ্গালীর শিক্ষার অপরিহার্য্য অংশ রূপে ধার্য্য করেন, যাতে করে প্রত্যেক বাঙ্গালী যুগের পর যুগ তার শাশ্বত বাঙ্গালীত্ব বজায় রাখতে পারে—যাতে করে ভবিষ্যৎ যুগের বাঙ্গালী শাশ্বত বাঙ্গালীর মূলীভূত বৈশিষ্ট্য হতে বঞ্চিত ও বিচ্যুত না হয়।

আমরা প্রগতির বিরুদ্ধে নই। বাঙ্গালীকে বিজ্ঞানে, শিল্পে এবং আধুনিক যুগের সকল কলা-বিদ্যায় পৃথিবীর সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সংযোগ ও ধারা-বাহিকতা বজায় রাখতে হবে শাশ্বত বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাবধারার, আদর্শধারার ও ছন্দধারার সঙ্গে। ব্রতচারী সংচেষ্টা বাঙ্গালীকে পিছিয়ে দিতে চায় না, তাকে 'প্রাদেশিকতা'র আদর্শ দেখিয়ে সঙ্কীর্ণ করে রাখতে চায় না। ব্রতচারী এটা জোরের সহিত বলতে চায় যে, ভারতের লোক আগে সম্পূর্ণ ভারতীয় না হলে যেমন প্রকৃত বিশ্ব-মানবত্ব লাভ করতে পারবে না, তেমনি প্রত্যেক বাঙ্গালী যদি প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ তার উৎপত্তি-ভূমির গভীর তলদেশে তার জীবনের শিকড়

প্রোথিত করে' তার চিরপ্রবাহিত সংস্কৃতিধারা থেকে জীবনীরস আহরণ করে' পূর্ণ বাঙ্গালী না হয়, তা হলে সে প্রকৃত ভারতবাসী হতে পারবে না। কেবল বস্তুতান্ত্রিকতামূলক বাহ্যিক ঐক্যে বা প্রগতিতে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব এবং ভারতীয়ত্ব রক্ষা হবে না।

বী-র-বা

(বীর বাঙ্গালী)

দোর্দ্দণ্ড বীরবিক্রম জাত বাঙ্গালী—
যুগে যুগে নেচে যায় রায়বেঁশে ঢালী।

প্রতাপাদিত্য আর ধর্ম্মপালের দল,
হোসেন শা' ঈশা খাঁর সমর-চমূবল—
গড়েছিল এরা বাংলাকে দুর্জ্জয়
ঘোষেছিল শৌর্য্য সারা ভারতময়॥

আমরা বাঙ্গালী, তাদেরি সন্তান—
সাজাব বাংলাকে বিশ্বময় জয়বান॥

বাংলার জাতিগঠনে ব্রতচারীর স্থান

বর্ত্তমান যুগের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায় এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই ব্রতচারীর আসল মর্ম্মকথাটি হয় বুঝতে পারছেন না, অথবা ভুল বুঝছেন। তার কারণ এই যে আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালের শিক্ষা পাশ্চাত্য জগতের ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য জগৎ যে বস্তুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভাবনীয় বিকাশ ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পেরেছে, এটা স্বীকার্য্য। কিন্তু এটাও ঠিক এবং পাশ্চাত্য জগতের সবচেয়ে চিন্তাশীল সুধীগণ এটা স্বীকার করেছেন যে, পাশ্চাত্য জগতের ভাবধারা খণ্ডতাদোষে দুষ্ট; জীবনের সমগ্রতাকে পাশ্চাত্য জগৎ বহু অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক বিভাগে আলাদা আলাদা সাধনার চেষ্টা করছে। এতে করে বিরোধ দাঁড়িয়েছে ধর্ম্মে ও বিজ্ঞানে, শারীরিক প্রগতিতে ও আধ্যাত্মিক প্রগতিতে, এবং জাতীয়তার সঙ্গে বিশ্বমানবের ঐক্যের

আদর্শে। যতদিন আমরা পাশ্চাত্য জগতের বস্তুবিজ্ঞান-প্রগতির মোহে মুগ্ধ হয়ে তাদের বাহ্যতান্ত্রিক প্রণালীর দ্বারা জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করব, ততদিন আমরাও ভারতের প্রাচীন আদর্শগত জীবনের সমগ্রতাবোধ ও সমগ্রতার সাধনাপ্রণালী হারিয়ে এই খণ্ডবিখণ্ডতার অকূল সমুদ্রে হাবুডুবু খাব।

ব্রতচারী চায়, ভারতের ও বাংলার মানুষকে আবার ভারতের সেই নিজস্ব সমগ্রতামূলক আদর্শ ও জীবনের সাধনা প্রণালী ফিরিয়ে দিতে। বিশ্বজগৎ যে একটা যান্ত্রিক জগৎ নয়, কেবল একটা বস্তুতান্ত্রিক ব্যাপার নয়, এর সমস্যাগুলির সমন্বয় ও সমাধান যে কেবল বাহ্যিক পদার্থবিজ্ঞানের তথ্য দ্বারা হবে না, ব্রতচারী এটা বুঝিয়ে দিতে চায়। আর বুঝিয়ে দিতে চায় যে, পাশ্চাত্য জগৎ আধ্যাত্মিক ও বস্তুতান্ত্রিক—এই দুই ক্ষেত্রে যে একটা বিভাগ করে বসেছে, এই বিভাগ অসত্য। বস্তুজগতের সমস্যার সমাধান ততদিন হবে না, যতদিন না বস্তুজগৎকে আমরা আধ্যাত্মিক ভাবের মধ্য দিয়ে দেখতে শিখব।

সৃষ্টির মূলীভূত যে ঐক্য, তাকে আমাদের আবার হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এবং কি বস্তু-জীবনে কি অধ্যাত্মজীবনে — যাবতীয় সমস্যার সমাধানে সেই ঐক্যবোধকে নিযোজিত করতে হবে। এটাই ছিল প্রাচীন ভারতের ধারা, এবং ব্রতচারীরও মর্ম্মকথা এই। যাকে বলে ইংরাজীতে Creative Unity অর্থাৎ সৃষ্টিগত ঐক্য —সেই সৃষ্টিগত ঐক্যের দিক দিয়ে দেখলে বস্তুতান্ত্রিক ক্ষেত্র ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিভাগ নেই। যাকে আমরা জড়বস্তু বলে অবজ্ঞা করি, তার মধ্যেও অসীমের সমাবেশ রয়েছে। একই সত্ত্বার প্রকাশের সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা, আন্তরিকতা ও বাহ্যিকতার মাত্রার তারতম্যে বস্তুজগতের ও অধ্যাত্মজগতের পার্থক্য আমাদের সাধারণ বিচারে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এর ভিতরকার সৃষ্টিগত ঐক্যকে একবার গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলে সব বিভিন্নতা দূর হয়ে গিয়ে এক মহা ঐক্য ও মহা সমন্বয়ের এবং শান্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এই মহা সমন্বয়ের অনুভূতি ভারতীয় সংস্কৃত মন্ত্রে "ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ

শান্তিঃ” এই বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রতচারী আপামর মানুষের মনে নিখিল জগৎ-প্রকৃতির এই চূড়ান্ত সমন্বয়ের অনুভূতি আনিয়ে সেই চূড়ান্ত শান্তির সন্ধান দিতে চায়।

এই প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেখলে বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মে কোন বিরোধ থাকে না, এবং জাতীয়তায় ও আন্তর্জ্জাতিক ঐক্যেও কোন বিরোধ থাকে না। ব্রতচারী আদর্শে এই বিরোধবিহীনতার মূল প্রণালীটি আমরা এখন বুঝতে চেষ্টা করব। কিন্তু এটা বুঝতে হলে, ঐ মূল সত্যটি প্রথমে মেনে নিতে হবে যে, বস্তুজগতে ও অধ্যাত্মজগতে কোন প্রাচীর-বিভাগ নেই। মানুষ পৃথিবীর জীব। একদিকে এই পৃথিবী হতে সে উৎপন্ন, এই হিসাবে তার উৎপত্তিভূমির সঙ্গে তার আত্মার ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। আবার অপরদিকে এই ভূলোকের সঙ্গে দ্যুলোকের, অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, নক্ষত্র-মণ্ডলীর একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। সেই রকম মানুষের জীবনের সঙ্গেও এই দিঙ্‌মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। এতে করে আমরা একটা মহৎ ঐক্যের সূত্র পাচ্ছি,

হলে পৃথিবীর সব মানুষ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হবে। আবার তৃতীয় প্রণালীর লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন—পৃথিবী থেকে সব ধর্ম্মকে তাড়িয়ে দিতে হবে, জাতীয়তাবোধকে তাড়িয়ে দিতে হবে—এক মানুষ আব এক মানুষকে বলবে, আমরা মানুষ—অতএব এক , কোন মানুষেব কোন বিশিষ্ট ভূমিবোধ থাকবে না, কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মবোধ থাকবে না, সব একাকাব হয়ে যাবে।

ব্রতচারীর মতে, এর কোনটাই সত্য নয় এবং তিন পন্থার কোনটিতেই পৃথিবীর মানুষ তার অন্তর্নিহিত ঐক্যেব বাস্তব জীবনে কোন সন্ধান পাবে না। ব্রতচারীব মতে সৃষ্টিগত ঐক্য ভূমিগত বৈচিত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং সেই ভূমিগত বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে যতক্ষণ আমরা না যাব, ততক্ষণ—কি ধর্ম্মের দিক দিয়ে কি সংকৃষ্টির দিক দিয়ে—হাজার বার 'বিশ্বমানবতা' 'বিশ্বমানবতা' বলে চেঁচিয়ে একে অন্যকে আলিঙ্গন করে মানুষ তার প্রকৃতিগত একতা লাভ করতে পারবে না। ব্রতচারী প্রণালীর মর্ম্মকথা এই যে, মানুষ এক ভূলোকজাত হয়েও তার সেই ভূলোকজাত ঐক্যের

সন্ধান পাবে একমাত্র তার ভূমিগত বৈচিত্র্যের সাধনার ভিতর দিয়ে।

মোটকথা, যে সৃষ্টিগত ঐক্যের কথা আমরা বলেছি, তার সন্ধানের ও উপলব্ধির কয়েকটি সৃষ্টিগত ধাবা আছে। ধরা যাক, বাংলার মানুষের কথা। মোটামুটি আমরা বাংলার মানুষের জীবনে সৃষ্টিগত অন্তত তিনটি ধাপ দেখতে পাই। একটি বাংলার মানুষ হিসাবে—বাংলার ভূমিগত ঐক্যের ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ, ভারতের মানুষ হিসাবে—ভারতের ভূমিগত ঐক্যের ধাপ। এবং তৃতীয়, ভূলোকের মানুষ হিসাবে—অন্যান্য দেশের মানুষের সঙ্গে ভূলোকগত ঐক্যেব ধাপ। এই তিনটি ধাপের একটিকে অতিক্রম করে অন্যটির নাগাল পাওয়ার চেষ্টা যতই সরল ও সাগ্রহ ভাবে করা যাক না কেন, সৃষ্টিগত ঐক্যনীতির সঙ্গে তার মিল না থাকায় সেই চেষ্টা বিফল হবেই হবে। এর প্রমাণ আজকাল আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে পদে পদে দেখা যাচ্ছে। বাংলার মানুষ নিজেদের মধ্যে তাদের ভূমিজাত গভীর প্রকৃতিগত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা না করে নিখিল

বাংলার জাতিগঠনে ব্রতচারীর স্থান

ভারতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে যতদিন চেষ্টা করবে ততদিন সেই চেষ্টা—ধর্ম্মের ক্ষেত্রেই হোক, আর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই হোক—বিফল হবেই হবে। সেইরকম ভারতের মানুষ—তারা হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, খৃষ্টানই হোক—যতদিন ভারতের ভূমিগত গভীর ভাব ও ছন্দের ঐক্যধারা-প্রবাহ আপন আপন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে ভারতের সকল মানুষকে এক গভীর ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করতে না পেরেছে, ততদিন কি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের মানুষের সঙ্গে বিশ্বমানবতার ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা পণ্ড হবেই হবে।

যে সকল রাষ্ট্রনেতা অথবা রাষ্ট্র-পণ্ডিত বাংলার জাতীয় ঐক্য স্থাপনের চেষ্টাকে প্রাদেশিকতা বলে অভিহিত করেন, তাঁরা তদ্দ্বারা সৃষ্টির মূলগত ঐক্যনীতির সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রদর্শন করেন। ভারতের মানুষকে ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত করতে চাই বলেই এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের সঙ্গে ভারতের মানুষকে এক বিশাল ও গভীর ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত করতে চাই বলেই—গোড়ায় আরম্ভ করতে

চাই আমাদের নিজেদের ভূমিগত ঐক্যের যোগসূত্র গঠিত করতে। এটাই ঐক্যগঠনের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালী। এটা বোধ হয় এখন সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, ব্রতচারীর উদ্দেশ্য একাধারে আন্তর্জ্জাতিক ঐক্য গঠন এবং বাংলার জাতীয় ঐক্য গঠন করা; বাংলার জাতিগঠন করা।

জাতিগঠনের দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তরে-বাহিরে পূর্ণ শক্তিমান করা, আর একটি হচ্ছে জাতির সকল ব্যক্তিকে অন্তরে ও বাহিরে ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত করা। ব্রতচারী প্রণালীতে এই দুয়েরই উপাদান রয়েছে। এর প্রথম উপাদান অর্থাৎ আদর্শের দিকের উপাদান জোগায় ব্রতচারীর পঞ্চব্রত—পণ, মানা, প্রণিয়ম এবং সেগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ। ব্রতচারীর প্রণালীর আদর্শে আছে জীবনের সমগ্রতা। ইউরোপ আজকাল জীবনের সমগ্রতার আদর্শ হারিয়ে যে অতল ও অকূল পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছে, আমাদের দেশের মানুষও আজকাল ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংক্রমণে যে খণ্ডবিখণ্ডতার অকূল ও অতল

পাথারে নিমজ্জিত হতে বসেছে, তার থেকে ব্রতচারী চায় তাদের উদ্ধার করতে, পঞ্চব্রতের অর্থাৎ জ্ঞান-শ্রম-সত্য-ঐক্য-আনন্দের পরিপূর্ণ আদর্শের সন্ধান দিয়ে; এবং প্রতিদেশের মানুষকে তাদের আপন ভূমি-সংস্কৃতির সঙ্গে সৃষ্টিগত সংযোগ করিয়ে।

জাতির ঐক্য-গঠনের জন্য যে কি কি উপাদান দরকার, সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিতবর্গ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলে আজ আমাদের দেশে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ও নানা রাষ্ট্রীয় দলের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মুক্তির জন্য যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের দরকার এটা সকলেরই স্বীকার্য্য; কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় ঐক্য যে কি প্রণালীতে সৃষ্টি করতে হবে, সে সম্বন্ধে খুব সুস্পষ্ট ধারণা কম লোকেরই আছে বলে মনে হয়। আমরা এই প্রবন্ধে যা বলেছি তা যদি সত্য হয়, তা হলে এটা মেনে নিতে হবে যে, ভারতে রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য সংগঠন করতে হলে প্রথমত প্রত্যেক বিশিষ্ট ভূমির—যথা বাংলার ভূমিগত অর্থাৎ সংকৃষ্টিগত ঐক্যের সংসাধন

করতে হবে। তা না করে যদি কেবল ভারতের ঐক্য-সাধনেব জন্য চীৎকার করি, তবে তা নিশ্চয়ই নিষ্ফলতায় পরিণত হবে। বাংলার লোকের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশের লোকের যে ভাষাগত ঐক্য পর্য্যন্ত নেই, এ সত্যটা আমরা ভুলে যাই এবং এই ভুলের ফলে আমবা বাংলার সংকৃষ্টিগত ঐক্য-স্থাপনের কথা ভুলে গিয়ে তার চেয়ে বিশাল একটা সমগ্র ভারতীয় ঐক্য স্থাপন করতে চাই। এতে করে আমরা ভুলে যাই যে, নিজের মধ্যে আগে সমগ্রতা স্থাপন না করে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা বৃহত্তর সমগ্রতা স্থাপন জগতের সৃষ্টিগত প্রণালীর দিক দিয়ে অসম্ভব। সুতরাং ব্রতচারীর বাংলার জাতিগঠনের যে মূল চেষ্টা, তাকে বৃহত্তর জাতিগঠনের প্রথম ও প্রধান সোপান বলে গ্রহণ করতেই হবে।

বাংলার জাতিগঠন কি করে করতে হবে, এই প্রশ্নের উত্তর ক'জন রাষ্ট্রনেতা অথবা রাষ্ট্রপণ্ডিত দিতে পারেন বা কার্য্যক্ষেত্রে তার পরিচয় দিচ্ছেন, জানি না। বাংলাভাষার সংবৃদ্ধি যে এর একটা বিশেষ পন্থা, এ সম্বন্ধে বোধ হয় অনেকেরই অল্প-বিস্তর ধারণা আছে। এই ক্ষেত্রে ব্রতচারী আদর্শেব

সঙ্গে আমাদের দেশের অনেকেরই মতের মিল আমরা পাই। কিন্তু এ ছাড়া ঐক্য-সাধনের অন্যান্য উপাদান সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা জন-সাধারণেব মধ্যে আছে বলে মনে হয় না। ব্রতচারীর কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা আছে। সেটা হচ্ছে এই, জাতিগঠন করতে হলে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তরে এবং বাহিরে কয়েকটি সূত্র দিয়ে গাঁথতে হবে। সেই সূত্রগুলি হচ্ছে—সমান আদর্শ, সমান অভিরীতি (Convention) এবং সমান ইতি-ধারা। ব্রতচারী-আদর্শের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলার আবালবৃদ্ধকে একটা সমান আদর্শ দেবার চেষ্টা করছি। বাংলাভাষার ভেজালবিহীন সমান ব্যবহার দ্বারা, বাংলাভূমির প্রতি সমান প্রেমের উদ্রেকের দ্বারা, হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে বাংলার পূর্ব্বতন যুগের মহাপুরুষদের জীবন-আদর্শের গৌরবের সমান অনুপ্রাণনার দ্বারা, বাংলার জাতীয় নৃত্যগীতের পুনঃ প্রবর্ত্তনের দ্বারা, বাংলার নিজস্ব ভাব ও ছন্দধারার পুনঃ প্রবাহের দ্বারা, আমরা সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে সমান ইতিধারার সূত্রে গ্রথিত করতে দেশময় চেষ্টার প্রবর্ত্তন করেছি। জাতীয় সমান আরাবের,

আনন্দ-প্রকাশের সমান প্রথার এবং পরস্পর অভিভাষণের সমান রীতির প্রবর্ত্তন দ্বারা আমরা বাঙ্গালী জাতির শতধা খণ্ডবিখণ্ডিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীবনে সমান অভিরীতির স্থাপন করতে প্রয়াস পাচ্ছি। এক কথায় সমগ্র বাঙ্গালীর মধ্যে অগণিত ঐক্যধারা স্থাপনের যে চেষ্টা আজ ব্রতচারীব প্রণালীর ভিতর দিয়ে হচ্ছে, বাংলার ইতিহাসে বা ভারতের ইতিহাসে নানা দিক দিয়ে জাতি-গঠনের এরকম একটি বিরাট ও বিজ্ঞান-সঙ্গত চেষ্টা আর কোন যুগে অন্য কোন পরিচেষ্টার ভিতর দিয়ে একসঙ্গে হয় নি, এটা বোধ হয় জোর করে বলা যেতে পারে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মুক্তির জন্য ব্যগ্র যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে ব্রতচারীর কোন বিরোধ ত নেই-ই—বরং এটা জোর করে বলা যেতে পারে যে, তাঁরা যদি ব্রতচারীর সাহায্য অবলম্বন দ্বারা জাতির লক্ষ লক্ষ বিশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সংনিয়মিত, দেহে মনে চরিত্রে সুগঠিত এবং পরস্পর সমান আদর্শ, ইতিধারা ও অভিরীতির সূত্রে গ্রথিত না করে শুধু একটা রাষ্ট্রীয় বা অর্থনীতিগত বাহ্যিক ঐক্য-স্থাপনের চেষ্টা

করেন, তবে মানুষের অন্তরগত ঐক্য-স্থাপনের নিয়মকে তাঁরা অবহেলা করবেন; এবং তার ফলে তাঁদের ঐক্য-স্থাপনের প্রশংসনীয় চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হবে।

ধর্ম্ম-সমন্বয়ে ব্রতচারী *

ব্রতচারীর প্রণালীতে আছে, বিশ্বজগতের জীবনের অখণ্ড রূপ। ইহাতে আছে মানুষের জীবনের পূর্ণ অর্থের ও উদ্দেশ্যের সন্ধান, আর আছে দৈনন্দিন জীবনের আচরণের পূর্ণ বিধির নির্দ্দেশ; এবং অন্তর্জীবন ও চরিত্র-গঠনের ও কর্ত্তব্যপালনের পূর্ণ সাধনা-প্রণালী।

ধর্ম্ম বলতে যা সাধারণত বোঝায়, সেই অর্থে ব্রতচারী একটা আলাদা ধর্ম্ম নয়। কিন্তু সকল ধর্ম্মের সঙ্গে এর একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, কারণ জগতের সকল ধর্ম্মের মূলীভূত সত্যগুলির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। আর তাতে করেই এর দ্বারা সকল ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন সম্ভবপর হবে।

ব্রত বলতে বোঝায়, কোন একটি পবিত্র অভীষ্ট সাধন-কল্পে ছন্দোবদ্ধ রীতিনিয়মের অনুষ্ঠান। ব্রতচারী তাঁকেই বলে, যিনি সমস্ত জীবনকে এই

---

* রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী ধর্ম্ম মহাসম্মেলনে প্রবর্ত্তক-জীর অভিভাষণের মর্ম্মানুবাদ।

রকম একটি পবিত্র ব্রতরূপে গ্রহণ করেন এবং সমস্ত জীবনকে একটি উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করে ছন্দোবদ্ধ প্রণালীতে তার অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকেন। সেই উচ্চ আদর্শ হবে একাধারে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক; কেননা ব্রতচারীর মতে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে কোন প্রাচীর-বিভাগ নেই। জীবনের এই যে সমগ্র ব্রত, তাকে পাঁচ ভাগ করে—জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য, আনন্দ এই পাঁচটি ব্রতে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এটা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে, এই বিভাগটি খালি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে সাধনার সুবিধার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে তারা একটি অখণ্ড ব্রতের অবিভাজ্য অংশ। সেই পূর্ণ জীবনব্রতের অখণ্ডতা রাখবার জন্য এই পঞ্চব্রতের সাধনা একাধারে অর্থাৎ একসঙ্গে করতে হবে। একটাকে ছেড়ে অন্য ব্রতগুলির সাধনা করলে, সেই সাধনা খণ্ডতা দোষে দুষ্ট হবে এবং জীবন অপূর্ণ হবে।

ব্রতচারী কোন সম্প্রদায়-বিশেষের অথবা কোন শ্রেণী-বিশেষের জন্য নয়। ইহা আবালবৃদ্ধবনিতা-নির্ব্বিশেষে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক জাতির

সকল মানুষের জীবনের পূর্ণতা লাভের সাধনা-পন্থা। এতে আছে, চরিত্র-গঠনের, শরীর-গঠনের, কর্ম্ম-সাধনার, শ্রম-সাধনার এবং জাতীয় নৃত্যগীতের ভিতর দিয়ে সমষ্টিগতভাবে আনন্দ ও ঐক্য-সাধনার উপাদান। এর বাহ্যিক অভিরীতির মধ্যে আছে—একটি সমসাধারণ অভিবাদন-প্রণালী, সম্বোধন-প্রণালী ও সঙ্ঘ-আরাব। সকল শ্রেণীর ও সকল বয়সের মানুষের জীবনযাত্রানির্ব্বাহের পূর্ণ বিধি-নির্দ্দেশ এতে আছে।

এই যে পাঁচটি মূলীভূত ব্রতের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি কার্য্যে পরিণত করবার জন্য বাংলার ব্রতচারীকে নিতে হয় ষোলটি পণ ও সতেরটি মানা। পণগুলিতে বেশী করে জোর দেওয়া হয়েছে—শ্রমের মর্য্যাদা ও অবশ্যকর্ত্তব্যতার উপর, জীবনের স্বাস্থ্য ও শুদ্ধতা সম্পাদনের উপর এবং প্রাণের আনন্দ বিধানের উপর। ছোট ব্রতচারী অথবা ছো-বদের জন্য যে বারটি পণ আছে, সেগুলি তাদের জীবন-গঠনের বিশেষ উপযোগী।

বর্ত্তমান যুগে মানুষের জীবন কি অন্তর্ক্ষেত্রে কি বহিঃক্ষেত্রে সংগ্রামে ও সংঘর্ষে, অনৈক্যে ও

অসমন্বয়ে শতধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তার প্রধান কারণ এই যে বর্ত্তমান যুগে মানুষ জীবনের অখণ্ডতা ভুলে গিয়ে তাকে আধুনিক বস্তুবিজ্ঞানের প্রণালীতে বিখণ্ডিত করে দেখবার প্রয়াস করছে, আর তার অখণ্ড জীবনকে বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, শরীর, মন, চরিত্র ইত্যাদি নাম দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা কোঠায় বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেকটির সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ভাবে চর্চ্চা করবার চেষ্টা করছে। আর বিশ্বের মূলীভূত যে ছন্দশক্তি, তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও উপেক্ষা করে জীবন থেকে বহির্ভূত করে দিয়েছে; এবং তার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে এই ছন্দশক্তি একেবারে লোপ পেয়েছে।

জীবনের এইরূপ পৃথক পৃথক কোঠা-বিভাগের ফলে ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান উভয়ই অনৈক্য ও দ্বন্দ্বের উৎপাদক হয়ে পড়েছে; এবং সাধারণ মানুষের জীবন ছন্দের সমন্বয়-বিধায়ক শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে বিখণ্ড ও অন্তর্বিরোধময় হয়ে পড়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও শারীরিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি পৃথক পৃথক কোঠা-বিভাগের অতি বিষময় ফল

ফলেছে, যাতে করে বর্ত্তমান যুগে মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত না হয়ে এমন একটা অস্বাভাবিক জীব হয়ে পড়েছে, যার কি বহির্জীবনে কি অন্তর্জীবনে, কি ব্যক্তিগতজীবনে কি সামাজিক জীবনে, না আছে শান্তি, না আছে সমন্বয়।

ব্রতচারী সংচেষ্টা চায় মানুষের জীবনকে এই অস্বাভাবিক বিখণ্ডতা থেকে মুক্ত করে আবার আদর্শের পূর্ণতা ও আচরণের সমন্বয় দান করতে, যাতে করে প্রত্যেক মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে, বিশ্বমানবের সঙ্গে, এবং তার আপন মাতৃভূমির সংস্কৃতিধারার সঙ্গে স্বাভাবিক ও সুসমঞ্জস সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে। তা ছাড়া এই সংচেষ্টা প্রত্যেক মানুষকে দিতে চায় এমন একটি সহজ সরল সাধনা-পন্থার সন্ধান—যার দ্বারা সে তার অন্তর্জীবনকে সংনিয়মিত করতে পারবে এবং কি জাতীয় কি আন্তর্জাতিক জীবনে ঐক্যের গভীর উপলব্ধি প্রাণের মধ্যে আনতে পারবে।

ব্রতচারী-আদর্শবাদের মতে বিশ্বপ্রকৃতির ও বিশ্বমানবের জীবন আনন্দ থেকে উৎপন্ন ও আনন্দের উপর সংস্থিত। সুতরাং জীবনের কি

বাহ্যিক কি আন্তরিক—কি দৈহিক কি আধ্যাত্মিক, যে কোন দিক হোক না কেন—তার ক্রিয়া যদি আনন্দের উপব এবং আনন্দ-সঞ্চারক ছন্দ-সাধনাব উপর সংস্থিত না হয় তাহলে তা অবাস্তব ও পূর্ণতাহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই ছন্দ-সাধনায় লক্ষ্য হওয়া চাই যুগপৎ অধ্যাত্ম এবং ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে পরিপূর্ণ আদর্শ। এই পরিপূর্ণ আদর্শ নিহিত আছে,—জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য, আনন্দ—ব্রতচারীর এই পঞ্চব্রতের মধ্যে।

এই পঞ্চব্রতের একাধারে সাধনা দ্বারা মানুষ পারবে জীবনের অখণ্ডতার সংবিধান করতে, বিশ্ব-মানুষের সঙ্গে প্রাণের ঐক্যসূত্র স্থাপন করতে এবং জীবনেব পূর্ণ সমন্বয়ের দ্বারা পূর্ণানন্দ লাভ করতে। একটা উচ্চ অধ্যাত্ম আদর্শ লক্ষ্য কবে ছন্দসাধনা ব্যতীত মানুষের পক্ষে একদিকে যেমন নিজের অন্তর্জীবনের উপর স্বরাজ্য স্থাপন অসম্ভব, তেমনি অপর দিকে মানুষে মানুষে পরস্পর ঐক্যস্থাপনও অসম্ভব; সুতরাং যেমন ব্যক্তি-জীবনের সুসমঞ্জস পূর্ণ-বিকাশের দিক থেকে তেমনি জাতীয় জীবনের এবং আন্তর্জাতিক জীবনের

পূর্ণ ঐক্য-স্থাপনের দিক থেকে ছন্দের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। এই দিক থেকে দেখতে গেলে ব্রতচারী সংচেষ্টা ভারতের প্রাচীন আদর্শেরই নবরূপে প্রকাশ। তা ছাড়া বিখ্যাত গ্রীক মনীষী প্লেটোবর্ণিত প্রাচীন গ্রীসের মনুষ্য-গঠনের আদর্শের সঙ্গে এর আশ্চর্য্য মিল দেখতে পাওয়া যায়।

এই যে শরীর, মন ও বাক্যের যুগপৎ ছন্দ-সাধনা, এর মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক শক্তি নিহিত রয়েছে যাতে করে এনে দেয় জ্ঞান-লাভের তীব্র অনুরাগ, শ্রমের ও কর্ম্মের তীব্র আগ্রহ, সরলতার ও সত্য আচরণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক জীবনে সখ্য ও ঐক্যের তীব্র পিপাসা, এবং ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নির্ব্বিশেষে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আনন্দের অদম্য সঞ্চারণ।

বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মজীবন থেকে ছন্দসাধনার যে বিচ্যুতি ঘটেছে, সেটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর লক্ষণ। ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী হ্যাভলক এলিস তাঁর 'জীবননৃত্য' নামক পুস্তকে প্রতিপাদন করেছেন যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম তার প্রাথমিক অবস্থায় ছন্দাত্মক উপাসনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ

করেছে এবং তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, যে যখনই কোন একটা জীবন্ত ধর্ম্ম পৃথিবীতে আসে—যেটা যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাণহীন ব্যাপার নয়, পরন্তু আত্মার ঐকান্তিক আত্মপ্রকাশ—তখনই সে রূপায়িত হয় কোন না কোন প্রকার ছন্দোবদ্ধ উপাসনা অর্থাৎ নৃত্যের মধ্য দিয়ে। বস্তুত আমরা দেখতে পাই, বর্ত্তমান যুগে প্রচলিত একাধিক বহুব্যাপক ধর্ম্মে উপাসনার আহ্বান এবং উপাসনার প্রণালীতে আছে, ছন্দাত্মক স্বরবিন্যাস এবং দেহের ছন্দাত্মক গতিবিন্যাস। একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও শ্রীচৈতন্য ইত্যাদি মহাপুরুষের জীবনের এবং অপর দিকে সুফি-সম্প্রদায়েব সাধকদের জীবনের দৃষ্টান্ত থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় যে অন্তরের গভীর অধ্যাত্ম আরাধনা স্বভাবতই আত্মপ্রকাশ করে সহজ ছন্দের নৃত্য ও গীতের রূপের মধ্য দিয়ে।

ব্রতচারী আদর্শের ও আচারের দুটি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে—জনসেবায় আত্মনিয়োগ এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্ত্তব্য-সাধনমূলক কর্ম্মসম্পাদনে আগ্রহ। কর্ত্তব্যের ও কর্ম্মের আদর্শ যখন কায়-মনোবাক্যে ছন্দের রূপে প্রকাশ পায়, তখন তার

ফলে সেই কর্ম্মের আনন্দময় সংসাধনের একটি অপ্রতিহত শক্তির সঞ্চার হয় যাতে করে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের জড়তা ও কর্ম্মবিমুখতা স্বতই নির্ব্বাসিত হয়। তাই ব্রতচারী সংচেষ্টার ভিত্তি অধ্যাত্ম আদর্শে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও এই সংচেষ্টা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের কর্ত্তব্য সংসাধনের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং কর্ম্মের ও জনহিতসাধনের আনন্দে আত্মবিস্মৃতির ভিতর দিয়ে বহুর সঙ্গে ব্যক্তির আন্তরিক প্রাণের মিল ঘটিয়ে দেয়। সমগ্র বাংলাদেশময় ব্রতচারীর এই কর্ম্ম-প্রেরণার দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়। যেখানেই এই প্রচেষ্টা প্রসার লাভ করেছে, সেখানেই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পল্লী সংগঠনের বিপুল সাড়া পড়েছে।

ব্রতচারীর পণ, নৃত্য ও গানগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এগুলির দ্বারা মানুষের জীবনের প্রত্যেক বিভাগের যুগপৎ ছন্দোবদ্ধ সংনিয়মের ফলে ব্যক্তির অন্তর্জীবনের বিশুদ্ধতা সাধিত হয়; তমোবৃত্তি-গুলিকে দমন করবার শক্তি লাভ হয় এবং ব্যক্তি তার অন্তর্জীবনের উপর আধিপত্য ও প্রকৃত স্বরাজ্য

লাভ করতে সক্ষম হয়। এর সাহায্যে এক দিকে যেমন চরিত্র সুগঠিত হয় তেমনি অপর দিকে আবাব দেহের শক্তি সংসাধিত হয়। আর, এ দুটোর মধ্যে একটাকে অতিক্রম করে অন্যটির অতিরিক্ত বৃদ্ধি না হয়ে দুটিরই সুসমঞ্জস বিকাশ সাধিত হয়।

ব্রতচারী-সাধনা প্রত্যেক পুরুষ এবং নারীকে বিশ্বের আদর্শ-পৌরজন হবার শক্তি এনে দেয় বটে, কিন্তু এব একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মতে বিশ্ব-প্রকৃতির একত্বের সন্ধান লাভ করা একমাত্র সম্ভব তার বিভিন্ন ভূমিগত বৈচিত্র্যের সাধনার ভিতর দিয়ে—যে-বৈচিত্র্য প্রত্যেক ভূমিজাত আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিগত ক্রমধারার রূপে প্রকাশ পায়। এই দ্বিবিধ সাধনা ব্রতচারীকে যুগপৎ করতে হবে বলে প্রত্যেক ব্রতচারীকে যুগপৎ দ্বিবিধ পণ নিতে হয় এই মর্ম্মে যে, সে যেমন এক দিকে বিশ্ব-মানবের জীবনের সঙ্গে তার মূলীভূত ঐক্যের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করবে তেমনি অপর দিকে তার ভূমিগত মাতৃকার সংস্কৃতিধারার ভিতর দিয়ে সে আত্মপ্রকাশ করবে। এই দ্বিবিধ আনুগত্যের

ধর্ম্ম-সমন্বয়ে ব্রতচারী

সাধনার ফলে ব্রতচারী জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধির আদর্শের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ঐক্যেব ও শান্তির সমন্বয় করতে সমর্থ হয়। যেগুলিকে সাধারণত পরস্পব বিপরীত লক্ষ্য বলে মনে করা হয় সেগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপনার ব্রতচারীর এই যে প্রতিভা, তা যে কেবলমাত্র একটা কাল্পনিক কথা নয়, এর প্রমাণ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পাওয়া গেছে। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, বাংলা দেশে ব্রতচারী যেমন এক দিকে বাংলার একটি তীব্র জাতীয়তাবোধ দিতে সমর্থ হচ্ছে, তেমনি আবার বরদার মহারাজা গাইকোয়াড এবং হায়দরাবাদের নিজামের প্রধান মন্ত্রী স্যর আকবব হায়দরীর মতে ইহাতে সমগ্র ভারতের মানুষের শারীরিক ও চারিত্রিক শক্তি-বিকাশের এবং জাতীয় ঐক্যগঠনের উপাদান বিদ্যমান আছে। বাংলা দেশে এই সংচেষ্টা বাংলার ভাষা এবং বাংলার জীবনধারার ভিতর দিয়ে রূপায়িত হচ্ছে বটে, কিন্তু ইহার মূলীভূত প্রণালীগুলি ভারত মহাভূমির অন্যান্য ভূমিখণ্ডের পক্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভূমির পক্ষেও প্রযুজ্য ; এবং প্রত্যেক

ভূমিতে ইহাকে সেই ভূমির নিজস্ব ভাষা, ছন্দ ও সংস্কৃতি-ধারা এবং জীবনসমস্যার ভিতর দিয়ে রূপায়িত করতে হবে। ইংলণ্ডের মতো প্রগতিশীল ভূমির পক্ষেও যে এই সংচেষ্টার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা রয়েছে, তা স্যর মাইকেল স্যাডলার, লরেন্স বিনিময় এবং স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড প্রমুখ মনীষীগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন এবং শেষোক্ত মনীষী ইংলণ্ডে এই সংচেষ্টা বিস্তার করবার ভার স্বেচ্ছায় ও সাদরে গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীতে বর্ত্তমান যুগে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জাতিতে জাতিতে যে ভীষণ দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের উৎপত্তি হয়েছে তার নিরাকরণ করে ব্যবহারিক জীবনে ও ধর্ম্মজীবনে গভীর শান্তি ও সমন্বয় আনবার শক্তিমত্তা রয়েছে ব্রতচারী সাধনায়। কেন না এর ভিতর দিয়ে প্রত্যেক মানুষ তার জন্মগত ছন্দশক্তির বিকাশ করে' সাবলীল আত্মপ্রকাশ দ্বারা একদিকে যেমন ব্যক্তিজীবনে পূর্ণ মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করতে সক্ষম হবে, আবার অপরদিকে তেমনি পঞ্চব্রত-মূলক পূর্ণ আদর্শ লাভ ক'রে এবং বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত

ছন্দশক্তি ও আনন্দ শক্তির উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে' ভূমার অখণ্ড ঐক্য ও অদ্বৈততার উপলব্ধি জীবনে ওতপ্রোতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা-নির্ব্বিশেষে সকল জাতির এবং সকল ধর্ম্মের লোক, ভারতের অন্যান্য ভূমিখণ্ডের ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বাংলা-প্রবাসী নরনারী ব্রতচারী-আদর্শকে সাদরে এবং আনন্দে গ্রহণ করেছেন এবং এর ভিতর দিয়ে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টাননির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব যোগসূত্র স্থাপিত হবার সূত্রপাত হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের বালকবালিকাদের শরীর ও চরিত্রের যুগপৎ সুসমঞ্জস বিকাশের আশ্চর্য্য শক্তির অবতারণা এর ভিতর দিয়ে হয়েছে; এবং অতি অল্প কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত যে বাঙ্গালী জাতির কর্ম্মবিমুখতা ও অলসতা কিম্বদন্তীর মতো হয়ে পড়েছিল, সেই জাতির জীবনের মধ্যে একটি আনন্দের অপূর্ব্ব অভিসিঞ্চন এবং কর্ম্মসাধনের অপূর্ব্ব আগ্রহ এনে দিয়েছে। এতে করে দৃঢ় আশা করা যায় যে সমগ্র ভারতে এবং সমগ্র

ধর্ম্ম-সমন্বয়ে ব্রতচারী

পৃথিবীতে ব্রতচারী-সাধনাব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ ভাবে করতে পারলে এর দ্বারা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ঐক্য, আনন্দ ও জনহিতসাধনের উৎসাহসৃষ্টির দ্বারা দিব্যজীবন লাভের পথ উন্মুক্ত হয়ে উঠবে।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত মহিলা কর্ম্মী এবং স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম্ম-মহাসভার বিশিষ্ট সভ্যা কুমারী উইনিফ্রেড রেঞ্চ প্রকাশ্যভাবে ব্রতচারী ভুক্তি গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন—"ব্রতচারী আদর্শের ভিতর দিয়ে আমার আত্মা মুক্তির সন্ধান পেয়েছে।" মনুষ্য-জীবনের অদ্বৈততার এবং অখণ্ডতার উপলব্ধি যে ব্রতচারী-সাধনার দ্বারাই বিশেষভাবে সম্ভব, তার সাক্ষ্য দিয়েছেন ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী লরেন্স বিনিয়ন তাঁর নিম্নের বাণীতে—

"বর্ত্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবীতে—বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশে বস্তুবিজ্ঞানের অতিমাত্রায় প্রগতির ফলে—আমরা জীবনের সমগ্রতা ও অদ্বৈততাব উপলব্ধি যেন হারিয়ে ফেলেছি। আমরা জীবন-যাত্রার যথার্থ ধারা থেকে যেন চ্যুত হয়ে পড়েছি।

ব্রতচারীর সাধনা-প্রণালী মানুষের জীবনে তার সত্যকার অখণ্ডতা ও অদ্বৈততার উপলব্ধি এবং মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টিগত গভীর যে সংযোগ তার সন্ধান এনে দিতে চায়।"

মানবজীবনের পূর্ণতাসাধনে ব্রতচারী-প্রণালীব শক্তিতে রবীন্দ্রনাথেব যে গভীর বিশ্বাস আছে, তাব প্রমাণ আমরা পাই তাঁব নিম্নলিখিত অভিবাণীতে—

"এই ব্রতচর্য্যা পালন করলে প্রাণের আনন্দ, কর্ম্মের শক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা ও লোকহিতসাধনের উৎসাহ দেশে বল লাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই।"

আমরা বাঙ্গালী

আমরা বাঙ্গালী
আমরা বাঙ্গালী
সত্যে ঐক্যে আনন্দে জীবন-প্রদীপ জ্বালি ॥
আমরা শ্রম-ব্রত পালি
আমরা জ্ঞান-ব্রত পালি—
কণ্ঠ মন আর অঙ্গ আমরা ছন্দে সঞ্চালি ॥
বাংলা ভূমির ঐক্য-সূত্র চিত্তে সঞ্চারি'
বাংলা-প্রেমে যুক্ত আমরা সব নর-নারী—
বাংলা-জন-সেবা-ধর্ম্মে আমরা প্রাণ ঢালি ॥
আমরা বাঙ্গালী
আমরা বাঙ্গালী।

আত্মগঠন ও জাতিগঠনে ব্রতচারী-পদ্ধতির অত্যাবশ্যকতা

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েব শিক্ষাপবিষদেব ভারপ্রাপ্ত প্রফেসব ফ্রেডাবিক ক্লার্ক ব্রতচাবী পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেছেন :—

"বর্ত্তমান যুগেব মানুষেব জীবন অতিমাত্রায় বাহ্যিক স্তবে চালিত হইতেছে। এই যুগে সব চেয়ে বেশী প্রযোজন মানুষেব জীবনের অন্তস্তরেব প্রভাবকে বিশেষ কবিয়া ফুটাইয়া তোলা। ইহার সংসাধন কাৰ্য্যে ব্রতচাবী পবিচেষ্টা অতি মূল্যবান সাহায্য কবিবে।"

বস্তুতঃ বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সকল দেশে কি ব্যক্তির জীবনে, কি জাতির জীবনে, কি আন্ত-র্জাতিক জীবনে যে ভীষণ বিবোধ, দ্বন্দ্ব ও অনৈক্যের সৃষ্টি হযেছে তার প্রধান কারণ—বর্ত্তমান যুগে মানুষের জীবন প্রধানতঃ বাহ্যিক স্তরে চালিত হচ্ছে। মানুষেব জীবনের অন্তরতম স্তরে যে আধ্যাত্মিক

সত্তা নিহিত আছে, তার প্রভাব থেকে মানুষ তাহার বাহ্য জীবনকে সম্পূর্ণ ভাবে বিযুক্ত করে ফেলেছে। এই বিযুক্তির ফলে বর্ত্তমান যুগে উৎপত্তি হয়েছে ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানেব ও প্রগতির দ্বন্দ্ব এবং বস্তুতান্ত্রিকতার চরম পরিণতি, যাতে করে মানুষ তার গভীর আধ্যাত্মিক দেবচরিত্রের সন্ধান হারিয়ে পরস্পর হিংসা-কলহে, দ্বন্দ্বে ও সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। সহজ কথায় বলতে গেলে আমবা বাংলার বাউল-কবিদের ভাষায় বলতে পারি যে এই যুগের মানুষ তার 'মনের মানুষে'র সঙ্গে সংযোগ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে; আর কেবল যে হারিয়ে ফেলেছে তা নয়, মনের মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার ও যুক্ত হবার যে গভীর আকাঙ্ক্ষা বাংলার বাউলের

"আমার মনের মানুষ খুঁজে বেড়াই
পাই না তার অন্বেষণ"—

এই অনুপম গীতাবলীতে প্রকাশ হয়েছিল, সেই আকাঙ্ক্ষাটিও হারিয়ে ফেলেছে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে কয়েকটি স্তর রয়েছে। তার শরীর ও ইন্দ্রিয়াশ্রিত মন এই দুটোর সম্মিলনে

বাহ্য মানুষের তৈরি। কিন্তু তার চেয়ে গভীরতর স্তরে যে অন্তর্মন বা অন্তরাত্মা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিহিত রয়েছে তাকেই বাউল কবি "মনের মানুষ" বলেছেন। বাইরের মানুষের উপর মনের মানুষের আধিপত্যের বিচ্যুতি যখন ঘটে তখনই বাইরের মানুষটি মনের মানুষের থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে, ও তার জীবন আত্মার অন্তরাদর্শ থেকে চ্যুত হয়ে কেবলমাত্র বাহ্যিক তমসাচ্ছন্ন আদর্শে চালিত হয়। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যে মানুষের জীবনে মনের মানুষের আধিপত্যের হ্রাস বা সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেছে এই কথাটাই প্রফেসর ফ্রেডারিক ক্লার্ক তাঁর উপরোক্ত অভিমতে ব্যক্ত করেছেন।

মনের মানুষের প্রভাব যখন বাহ্য জীবনে অনুভূত না হয় তখন মানুষের নিজের জীবনের মধ্যে একটা অন্তর্বিরোধ উপস্থিত হয় এবং তার ফলে তার জীবন পরিপূর্ণতা ও পূর্ণ সমন্বয় লাভ না করে' খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়ে অস্বাভাবিক ও অমানুযোচিত হয়ে পড়ে; সাত্ত্বিক ভাব থেকে চ্যুত হয়ে তার জীবন তমোভাব দ্বারা চালিত হয়। আবার অপর দিকে এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের

ও এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির সম্বন্ধ, মনের মানুষের গভীর আধ্যাত্মিক ঐক্যভাব হতে চ্যুত হয়ে, পরস্পর হিংসা ও দ্বেষের ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে— যেমন আধুনিক জগতে হয়েছে। মনের মানুষই ব্যক্তির প্রকৃত "স্ব" এবং তার ভাবই ব্যক্তির প্রকৃত 'স্ব'-ভাব।

সুতরাং আমাদের সামনে এখন এই দ্বিবিধ সমস্যা উপস্থিত। প্রথমতঃ প্রত্যেক মানুষের জীবনের ভিতরের মনের মানুষটিকে জাগ্রত করে তার বাহ্য জীবনের উপর অর্থাৎ তার ইন্দ্রিয়-রাজ্যগত শরীর ও মনের উপর সেই মনের মানুষের প্রভাব বিস্তার করতে হবে; ইন্দ্রিয়াশ্রিত মনকে মনের মানুষের আদর্শে চালিত করে অন্তঃশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি সাধিত করতে হবে, এবং "স্ব"-ভাবের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর দ্বিতীয়তঃ মানুষে মানুষে ভেদজ্ঞান বিদূরিত করে অদ্বৈত ভাবের সঞ্চার এনে বিশ্বমানবের সমাজে যথার্থ ও গভীর ঐক্যের সৃষ্টি করতে হবে। অর্থাৎ মানুষের সামনে দুইটি সাধনা—আত্ম-গঠন ও ঐক্য-গঠন,—জাতীয় ঐক্য ও আন্তর্জাতিক ঐক্য গঠন।

এ দুটির প্রথমটির সাধনা না করে দ্বিতীয়টিব সাধনায় সিদ্ধি অসম্ভব। বর্ত্তমান যুগে সকল দেশেই শিক্ষাপ্রণালীতে যথার্থ আত্ম-গঠন বা 'স্ব'-ভাব গঠন পদ্ধতির অভাব ঘটেছে বলেই কি জাতি-গত ঐক্য কি আন্তর্জাতিক ঐক্য সুসংস্থাপিত হতে পারছে না।

তাই ব্রতচারী-পদ্ধতির প্রথম লক্ষ্য আত্মগঠন; ও দ্বিতীয় লক্ষ্য মানুষে মানুষে—প্রথমতঃ জাতির মধ্যে ঐক্য গঠন অথবা সংক্ষেপে জাতি-গঠন; এবং তার পর জাতিতে জাতিতে ঐক্যগঠন, অথবা আন্তর্জাতিক শান্তি ও ঐক্য-স্থাপন।

অন্যান্য শিক্ষা-পদ্ধতি অধিকাংশ ভাবে বহির্মুখী; ব্রতচারী-পদ্ধতি অন্তর্মুখী। ব্রতচারী-পদ্ধতিব উদ্দেশ্য প্রথমতঃ প্রত্যেক মানুষের জীবনে তার মনেব মানুষের আধিপত্য স্থাপন করা; বহির্জীবনকে অন্তর্জীবনের অনুগত করে চালিত করা; শরীরকে মনের অনুগত করে চালিত করা; আবার বহির্মনকে অন্তর্মনের অনুগত করে চালিত করা, অর্থাৎ অন্তর্মন বা আত্মাকে সমস্ত জীবনের শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে ব্যক্তির জীবনে প্রকৃত

"স্বরাজ" বা অন্তঃস্বরাজ স্থাপন করা। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এই প্রকৃত স্বরাজ বা অন্তঃস্বরাজ স্থাপন না করে আমরা বাইরের স্বরাজ স্থাপনের চেষ্টায় আছি, এটাই বর্ত্তমান যুগের বহির্মুখী জীবনের ও অন্তর্মুখিতার অবহেলার একটি প্রকৃষ্ট লক্ষণ। জাতি-স্বরাজ লাভের চেষ্টায় আমরা আজকাল অতিমাত্রায় ব্যস্ত। কিন্তু আমরা এটা ভুলে গেছি যে ব্যক্তি-স্বরাজ বা অন্তঃস্বরাজ লাভের সাধনা না করে জাতি-স্বরাজ লাভ করার চেষ্টার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। জাতিগত স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভের যোগ্যতা তখনই আমাদের হবে যখন আমরা ব্যক্তিগত অন্তঃস্বাধীনতা ও অন্তঃমুক্তির সাধনা জীবনে ফলবতী করে তুলতে পারব। এই অন্তঃস্বরাজ, অন্তঃস্বাধীনতা বা অন্তর্মুক্তি লাভ করতে হলে আমাদের প্রত্যেকের ভিতরের অন্তর্মানুষকে দিতে হবে আমাদের জীবনের বাহ্য স্তরের উপর অর্থাৎ শরীর ও মনের উপর শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ভার। এই সাধনাই প্রকৃত আত্মগঠনের সাধনা। এর জন্য দুটি জিনিষের প্রয়োজন—একটি বিশুদ্ধ অন্তরাদর্শ বা অন্তর্লক্ষ্য,

আব অন্যটি হচ্ছে এই অন্তরাদর্শকে বা অন্তর্লক্ষ্যকে মন ও শরীবেব উপর প্রভাবান্বিত করে তোলবার কার্য্যকবী প্রণালী।

ব্রতচারী পদ্ধতির পঞ্চব্রত, পণ, মানা, প্রণিয়ম এবং ব্রতচারী গীতির বিশুদ্ধ ও উচ্চ ভাবের মধ্যে আছে প্রথম উপাদানটির প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। আর দ্বিতীয় উপাদানটির ব্যবস্থা আছে যুগপৎ কায় মন ও বাক্যের ছন্দোবদ্ধ পরিচালনায়। এই যুগপৎ কায় মন বাক্যের ছন্দোবদ্ধ পরিচালনার সাহায্যে ব্রতচারী তার সুগভীর অন্তর্জীবনের মহৎ আদর্শগুলিকে জীবনের সমগ্র স্তরে ওতপ্রোতভাবে অনুছন্দিত ও অনুপ্রেরিত করে জীবনের বাহ্যস্তরগুলিকে অন্তরাদর্শের সাহায্যে সুনিয়ন্ত্রিত করে তুলে আত্মশুদ্ধি, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মস্বরাজ স্থাপন করেন। কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকাকে নিজের মনের পরিকল্পনার অনুরূপ করে গঠন করে তোলে, ব্রতচারী তেমনি যুগপৎ কায়, মন ও বাক্যের ছন্দসাধনার দ্বারা বাহ্য জীবনকে—অর্থাৎ শরীর, মনোবৃত্তি ও চরিত্রবৃত্তিগুলিকে আত্মার গভীর পবিত্র আদর্শের অনুরূপ করে গঠন করে তুলতে

সক্ষম হন—এবং নিজের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণের ভাব নিজেই গ্রহণ করেন।

আত্ম-গঠন ও আত্ম-সৃষ্টির, চরিত্র-গঠন ও চরিত্র-নিয়ন্ত্রণের এই যে ছন্দাত্মক আভ্যন্তরীণ সাধনা-প্রণালী, এটিই হচ্ছে এই ক্ষেত্রে সব চেয়ে বিজ্ঞান-সঙ্গত, সব চেয়ে শক্তিশালী ও কার্য্যকর। এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করেই শ্রদ্ধেয়া সরলা দেবী চৌধুরাণী বলেছেন :—

"ব্রতচারী প্রগতির বাইরের শরীরটা হচ্ছে কতকগুলি নৃত্য, কিন্তু তার ভিতরের আত্মা হচ্ছে কতকগুলি ব্রত।......পণগুলি বা ব্রতগুলি অস্থি-মজ্জাগত করে দেবার জন্য জপের মত সেগুলি বারম্বার আওড়ানো বিশেষ ফলপ্রদ।......যেখানে যেখানে বাঙ্গালী ছেলেমেয়ে ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, সেখানে সেখানে এই মন্ত্রগুলির নিত্য জপ ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান যে দেশের মানসিক হাওয়া বদলে দেবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ যদি নিজেকে অন্তরে বাহিরে চরিত্রের দিক দিয়ে মানুষ হিসাবে ক্রমোন্নত করে' শক্তিশালী করে' তুলতে চায় তবে ব্রতচারী

প্রণালী অবলম্বনই তার সিদ্ধিলাভের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়।

মানুষের সত্তা হচ্ছে দেহ, মন ও আত্মা এই তিন স্তরে গঠিত। আজকাল বেশীর ভাগ দেশে বেশীর ভাগ লোক ও বেশীর ভাগ শিক্ষাপ্রণালীই হয় কেবল প্রধানতঃ দেহের চর্চ্চা নিয়ে অথবা প্রধানতঃ মনের চর্চ্চা নিয়ে—অথবা কেবল দেহ-মনেব চর্চ্চাতে ব্যাপৃত। সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন কাযাকলাপ থেকে অধ্যাত্ম জীবনের চর্চ্চাকে মানুষ দূর কবে একটা আলাদা কোঠায় রেখে দিয়েছে। তার ফলে বর্ত্তমান যুগে মানুষের জীবন অতি শোচনীয় ভাবে খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়ে পড়েছে। এটা বিশেষ করে দেখা যায় আজ-কালকার ব্যায়াম, খেলাধুলা বা শরীর-চর্চ্চার প্রণালীতে। এগুলিতে হয় আছে বেশী করে কেবল মাত্র দেহের শক্তিবৃদ্ধির প্রণালী, অথবা পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক উত্তেজনাপ্রদ চেষ্টা। এতে করে মানুষ একদিকে নিজের অন্তরে খণ্ড-বিখণ্ডিত হচ্ছে এবং অপব দিকে এক মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের অন্তরগত বিচ্ছিন্নতার ও শত্রুতার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ব্রতচারী প্রণালী ও ব্রতচারী সাধনায় দেহের ব্যায়ামের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে মনের ও আত্মার ক্রমোন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা। এটা সংসাধিত হয় ব্রতচারী নৃত্যগীতের ছন্দোবদ্ধ সাধনার সহায়তায়। দেহের চর্চ্চা যখন সঙ্গীতের ছন্দ-সাধনা থেকে বিযুক্ত হয় তখন সে অধ্যাত্ম ভাব থেকে বিচ্যুতি ঘটায়—মানুষকে দেবভাবাপন্ন না করে আসুরিক ও হিংস্রভাবাপন্ন করে তোলে।

প্রাচীন গ্রীসের মনীষীগণ ও রাষ্ট্রনেতাগণ এটি অতি স্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন। তাই প্রাচীন গ্রীসের শারীর-শিক্ষা প্রণালী ব্রতচারী প্রণালীর মতই সঙ্গীতের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে ও ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত ছিল। এমন কি প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স ও স্পার্টার বিখ্যাত বীরসৈন্যদলের শারীর-শিক্ষা প্রণালীও ঠিক ব্রতচারী প্রণালীর অনুরূপ সঙ্গীতের সঙ্গে গভীর ও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। বিখ্যাত গ্রীক মনীষী প্লেটো বলে গেছেন :—

"The result of hard gymnastic exercises and good living with no participation in music and philosophy is that the soul becomes weak and lame and blind, being never roused and never fed. Such a man

becomes a hater of reason and unmusical and accomplishes his aims by violence and fierceness like a brute beast and lives in ignorence and ineptitude."

"কড়া জিমনাষ্টিক ব্যায়ামের সঙ্গে যদি সঙ্গীতের ও উচ্চ আদর্শমূলক প্রেরণার ঘনিষ্ঠ সংযোগ না থাকে, তবে তার চর্চ্চার ফলে মানুষের আত্মা দুর্ব্বল খঞ্জ ও অন্ধ হয়ে পড়ে—কারণ শুধু শরীরের বাহ্যিক চর্চ্চাতে আত্মা না পায় তার জাগরণ, না পায় তার খোরাক। যে মানুষ শুধু এই প্রকার বাহ্যিক শরীর-চর্চ্চা করে সে হয়ে যায় গোঁয়ার, যুক্তিহীন ও সঙ্গীতহীন। সে পশুর মত বাহ্যিক বল-প্রকাশে মত্ত হয়ে, হিংস্র প্রবৃত্তি সম্পন্ন হয়ে পড়ে এবং মোহ-পরায়ণ ভাবে জীবন যাপন করে।"

এই ত গেল ছন্দ ও সঙ্গীত-সাধনার সঙ্গে শরীর-সাধনার সাধারণ সম্বন্ধ। এছাড়া বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে প্রত্যেক মানুষের দেহ ও মন তার আপন জন্মভূমি বা স্বভূমি থেকে জাত। সুতরাং তার স্বভূমিগত ছন্দধারার সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের দেহ-মনের একটি অতি গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। স্বভূমির ছন্দধারার সঙ্গে তার শিক্ষার

ও সাধনার যদি বিচ্যুতি ঘটে, তবে সেই শিক্ষায় বা সাধনায় তার চরিত্র ও আত্মা মৌলিকতাহীন ও বলহীন হয়ে পড়ে যা আজকাল বিশেষ করে দোঁআসলা ফিরিঙ্গীদের চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। স্বজাতীয় ভাষা, স্বজাতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যগীতেব চর্চ্চা যদি শারীর শিক্ষার ও মানসিক শিক্ষাব প্রণালীর একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ না হয়, তবে সে শিক্ষায় ব্যক্তির মন, চরিত্র ও আত্মা কখনো আত্মপ্রতিষ্ঠ, প্রকৃত শক্তিশালী ও মহৎ হতে পারে না। স্বজাতীয় ছন্দধারার সঙ্গে শারীর শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যেমন ছিল প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাপ্রণালীতে তেমনি ছিল বাংলার মানুষের জীবনের প্রাচীন পদ্ধতিতে। গ্রীক মনীষী প্লেটো একদিকে যেমন বলেছেন—"যে মানুষ নৃত্য ও গীতে শিক্ষা পায় নি, সে প্রকৃত ও পূর্ণ শিক্ষিত নয়"—তেমনি বাংলার মানুষের জীবনেও প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে নৃত্য-গীতের সাধনা ধর্ম্মের সঙ্গে ও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বাউল, জারী, ভাটিয়াল, কীর্ত্তন—এগুলির আনন্দময় ও অবলীলাময় চর্চ্চার ভিতর দিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল।

ব্রতচারী-পদ্ধতির অত্যাবশ্যকতা

পূর্ণ মানুষ গঠনের এই যে ছন্দাত্মক প্রকৃষ্ট প্রণালী, তাকেই ব্রতচারী-পদ্ধতির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশ আবাব পৃথিবীর মানুষকে শেখাবার জন্য উদ্যত হয়েছে।

এটা হল প্রত্যেক মানুষেব আত্মগঠনের দিক দিয়ে ব্রতচারী-পদ্ধতির মহামূল্যবান বৈশিষ্ট্য। এখন আমরা দেখব যে জাতিগঠনের দিক দিয়ে এবং আন্তজাতিক ঐক্য, সাম্য ও মৈত্রী গঠনের দিক দিয়েও ব্রতচারী পদ্ধতিব প্রণালী সবচেয়ে বেশী বিজ্ঞানসম্মত ও কার্য্যকর।

বিভিন্ন বিযুক্ত মানুষকে যদি ঐক্যসূত্রে বদ্ধ কবতে হয়, তবে বাইরে নানাপ্রকার সন্ধি বা মিলন-পত্র স্বাক্ষব করে তা যে করা অসম্ভব, তা আজকাল রাষ্ট্রীয ও সামাজিক জীবনে বেশ প্রমাণিত হচ্ছে। এমন কি আর্থিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে "সমবায়" প্রণালীতে বাহ্যিকভাবে যুক্ত হয়েও মানুষে মানুষে যে বাস্তবিক আন্তরিক ঐক্য স্থাপিত হচ্ছে না, তা আজকাল বেশ বোঝা যাচ্ছে। আসল কথা এই যে মানুষে মানুষে প্রকৃত ঐক্য স্থাপিত করতে হলে আগে তাদের

অন্তরে অন্তরে ঐক্য স্থাপিত কবতে হবে,—অন্তর্মানুষে অন্তর্মানুষে ঐক্য স্থাপিত করতে হবে। এটা করার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় সমছন্দতা স্থাপন। জগৎ-সৃষ্টির মূলে এক আত্মা বিরাজ করছেন বটে, এবং সকল মানুষের মধ্যেই সেই এক আত্মারই প্রকাশ বটে, কিন্তু মানুষে মানুষে প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যও স্বাভাবিক।

এই প্রকৃতিগত বৈষম্য ও বৈচিত্র্যকে একমাত্র ছন্দসাধনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। শত সহস্র সৈন্য যেমন সমছন্দ হস্তপদ বিক্ষেপমূলক অভিযানে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবকে বিদূরিত করে এক যুক্তশক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠে, ঠিক সেই ছন্দনিয়মের প্রভাবেই শত শত মানুষ যুগপৎ সমছন্দ সাধনার সাহায্যে ঐক্যমূলক আদর্শে অনুপ্রাণিত ও চালিত হয়ে পরস্পর বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতাব ভাবকে দূর করে অন্তরে অন্তরে ঐক্য স্থাপিত করতে পারে।

এইজন্যই ব্রতচারী নৃত্য ও গীতের সমছন্দ-সাধনা জাতীয় ঐক্য-গঠনের পক্ষে যে নিতান্ত উপযোগী, তা সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে স্বীকৃত হয়েছে। জাতি-স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে চাই

ব্রতচারী-পদ্ধতির অত্যাবশ্যকতা

জাতির শত সহস্র ও লক্ষ লক্ষ লোকের অন্তরাত্মাকে গভীর ঐক্যসূত্রে যুক্ত করার সাধনা। ঐক্যতানের সাধনা এ বিষয়ে সবিশেষ উপযোগী ও শক্তিশালী।

একটি জাতীয় সমসাধারণ আদর্শ গ্রহণ করে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে সেই আদর্শকে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত করাই জাতিগঠনের একটি প্রশস্ত প্রণালী। তাই ব্রতচারী সংচেষ্টায় আছে তার পঞ্চব্রতের, পণ-মানার ও প্রণিয়মেব এবং তার গীতাবলীর ভিতর দিয়ে একটি সমসাধারণ জাতীয় আদর্শেব অনুষ্ঠান, আর সমষ্টিগতভাবে যুগপৎ ছন্দ-সাধনার দ্বারা সেই সম-সাধারণ আদর্শটিকে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে সুপ্রবিষ্ট ও সু-প্রতিষ্ঠিত কবে তোলবার বিরাট ব্যবস্থা। এ ছাড়া জাতি-গঠন করতে হলে চাই সমসাধারণ ও নিজস্ব ভাষার ব্যবহার এবং সমসাধারণ অভিবীতির প্রতিষ্ঠা। ব্রতচারী তাই করে মাতৃভাষার অমিশ্র-ব্যবহারের সাধনা এবং সমসাধারণ অভিরীতির অনুষ্ঠান ও চর্চ্চা।

জাতি-গঠনের আর একটি প্রকৃষ্ট অপরিহার্য্য

উপাদান—যে ভূমিতে জাতির উৎপত্তি সেই স্বভূমিতে সমুৎপন্ন প্রত্যেক জিনিসের এবং প্রত্যেক রীতির নীতির ও বিশেষ করে ভাবের ও ছন্দের ধারার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ও সম্মান বোধ, এবং সে গুলির সযত্নে প্ররক্ষণ। যে দেশের মানুষ ভ্রান্ত প্রগতিমূলক আদর্শে বিমুগ্ধ হয়ে স্বভূমিতে উপজাত ভাবধারার বা ছন্দরূপধারার প্রতি অবজ্ঞা বা সঙ্কোচ অনুভব করে এবং সেগুলিকে বর্জ্জন করে, অন্য ভূমির ভাব ও ছন্দধারাকে জীবনে পরিগ্রহণ করতে ব্যস্ত হয়, সে জাতি প্রকৃত অন্তঃস্বরাজ ও মৌলিকতা লাভ হতে বঞ্চিত হয়, ও বাহ্যিক রাষ্ট্রীয় স্বরাজ লাভ করতে পারলেও সে জাতি তার আত্মার স্বছন্দ স্বধারা ও স্বভাব হতে চ্যুত হয়ে চিরদিনের জন্য বাস্তবিকপক্ষে পরাধীন হয়ে থাকে।

তাই বাংলার মানুষকে জাতীয়তার গৌরবে গৌরবান্বিত ও ঐক্যবদ্ধ করে তুলে এক জাতি করে গড়বার উদ্দেশ্যে বাংলার মানুষের স্বভূমির যে সকল ছন্দরূপের ধারা, যার মধ্যে খাঁটি বাঙ্গালী জাতির যুগ-যুগ-বাহী শৌর্য্য, অধ্যাত্মভাব ও আনন্দের প্রধারা সুগভীর ভাবে নিহিত রয়েছে,

সেগুলিকে প্রত্যেক বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ের জীবনে অনুপ্রবিষ্ট ও অনুপ্রবাহিত করে তুলবার বিশাল ব্যবস্থা ব্রতচারী পরিচেষ্টায় রয়েছে। রায়বেঁশে ও ঢালী রণনৃত্যের ও তদানুষঙ্গিক রণবাদ্যের প্রাণোন্মাদক ছন্দ-প্রধারার ভিতরে নিহিত আছে বাঙ্গালী জাতির যুগ-যুগ বাহী শৌর্য্য-গৌরবের ইতিধারা, তারা বাউল কীর্ত্তন ইত্যাদি নৃত্য-গীতের অনুপম ছন্দধারার মধ্যে নিহিত আছে বাঙ্গালী জাতির যুগ-যুগ-বাহী আধ্যাত্মিক চিত্তশুদ্ধি-সাধনার ইতিধারা; কাঠি ঝুমুর ইত্যাদি নৃত্য-গীতের এবং বাংলার মেয়েদের অনুপম ব্রত-নৃত্যের ছন্দধারার মধ্যে নিহিত আছে আমাদের জাতির গতিশীল জীবন্ত বলিষ্ঠ আত্মার সহজ আনন্দ প্রকাশের ইতি-ধারা। এই ছন্দোময় ইতিধারাগুলিকে জাতির জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রবাহিত করে রাখতে পারলে আমরা আবার আমাদের জাতির আত্মার ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য রক্ষা করতে ও আমাদের জাতীয় আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করতে ও বৰ্দ্ধিত করতে পারব। বিশ্ব-মানবের আসরে বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্ট অবদান দিতে হলে এসব

জাতীয় ছন্দ-সংস্কৃতিগুলিকে আমাদের সযত্নে ও সগৌরবে প্ররক্ষণ ও পরিচর্চ্চা করে রাখতে হবে—যেমন ইংলণ্ডের, স্কটল্যাণ্ডের, জার্ম্মেনী ও রুশিযার নবনারীগণ তাদের জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমূলক নৃত্যগীতের সযত্নে ও সগৌরবে প্ররক্ষণ ও পরিচর্চ্চা করে আসছে।

এই উপলক্ষে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের লোক-নৃত্য ও লোকগীতি-প্ররক্ষণ প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তক সেসিল সার্প (Cecil Sharpe) ইংলণ্ডের বিষয়ে যা বলেছেন তা বাংলার এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইংলণ্ডের তৎকালিক শিক্ষা-পদ্ধতিকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন :—

"Our system of education is at present too cosmopolitan; it is calculated to produce citizens of the world rather than Englishmen. And it is Englishmen, English citizens, that we want. How can this be remedied? By taking care, I would suggest, that every child born of English parents, is, in its earliest years, placed in possession of all those things

which are the distinctive products of its race. The first and most important of these is the mother tongue. Its words, its grammatical constructions, its idioms, are all characteristic of the race which has evolved them, and whose ideas and thoughts they are thus peculiarly fitted to express. The English tongue differs from the French or German precisely as the Englishman differs from the Frenchman or the German. Irish patriots are fully alive to this, and, from their own point of view, are quite right in advocating the revival of the Irish language.

"Then there are the folk-tales, legends, and proverbs, which are peculiar to the English: the national sports, pastimes, and dances also. All these things belong of right to the children of our race, and it is as unwise, as it is unjust, to rob them of this their national inheritance.

"Finally, there are the folk songs, those simple ditties which have sprung like wild flowers from the very hearts of our countrymen, and which are as redolent

of the English race as its language. If every English child be placed in possession of all these race-products, he will know and understand his country and his countrymen far better than he does at present ; and knowing and understanding them he will love them the more, realise that he is united to them by the subtle bond of blood and of kinship, and become, in the highest sense of the word, a better citizen and a truer patriot.

"The discovery of the English folk-song, therefore, places in the hands of the patriot, as well as of the educationist, an instrument of great value. The introduction of folk-songs into our schools will not only affect the musical life of England ; it will tend also to arouse that love of country and pride of race, the absence of which we now deplore."

"বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালী অতিমাত্রায় সার্ব্বভৌমিক হয়ে পড়েছে। এই শিক্ষা-প্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বমানব গড়ে তোলা, ইংরেজ-মানুষ গড়ে তোলা নয়। কিন্তু

ব্রতচারী-পদ্ধতির অত্যাবশ্যকতা

আমরা চাই, ইংলিস্‌ম্যান, ইংরেজ, ইংলণ্ডের প্রেম-পূর্ণ পৌরজন। শিক্ষা প্রণালীর এই যে দোষ, এটা কি করে নিরাকরণ করা যায়? এটা নিরাকরণ করবার উপায় হচ্ছে এই যে জাতির প্রত্যেক বালক ও প্রত্যেক বালিকাকে তার জীবনের অতি-প্রাথমিক কাল থেকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করে দিতে হবে তার স্বজাতির বিশিষ্ট সংসৃষ্টিগুলির সঙ্গে। স্বজাতীয় সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান হচ্ছে স্বজাতীয় ভাষা—মাতৃভাষা। স্বজাতীয় ভাষার অথবা মাতৃ-ভাষার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি ব্যাকরণগঠিত বাক্যবিন্যাস, প্রত্যেকটি অনুপ্রযোগের (idiom) মধ্যে নিহিত আছে, যে জাতি সেগুলিকে গঠন করে তুলেছে এবং যে জাতির চিন্তা ও ভাব তার মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, সেই জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ। একটি ইংরেজের সঙ্গে ও একটি ফরাসী বা জার্মেন মানুষের যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, ইংরাজী ভাষার সঙ্গে ফরাসী বা জার্মেন ভাষার ঠিক সেই পার্থক্য রয়েছে। আয়র্লণ্ডের স্বজাতিপ্রেমিকগণ এটা বিশেষ করে উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁদের পক্ষ থেকে তাঁরা যে

আইরিশ ভাষার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করছেন তা সম্পূর্ণ সমীচীন।

"ভাষা ছাড়া আছে রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী এবং কিংবদন্তী, যেগুলি জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি—এবং তার পর হচ্ছে জাতীয় ক্রীড়া, জাতীয় খেলাধুলা, এবং জাতীয় নৃত্য। এগুলির প্রত্যেকটির উপর আমাদের জাতির প্রত্যেক শিশুর একটা জন্মগত অধিকার বর্ত্তমান রয়েছে ; এবং এই জন্মগত অধিকারের প্রয়োগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা এক দিকে যেমন অন্যায়, তেমনি অন্য দিকে অতি অমঙ্গলকর।

"সর্ব্বশেষে আছে, আমাদের জাতির নিজস্ব লোকসঙ্গীত—যে সহজ সরল গান ও সুরের উচ্ছ্বাস বনফুলের মতই অতি স্বাভাবিক ও সহজ ভাবে আমাদের জাতির মানুষের প্রাণের উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে উঠেছে-এবং যার ভিতরে আমাদের জাতির ভাষার মতই আমাদের জাতির চরিত্র ও ভাবধারার গভীর সন্নিবেশ রয়েছে। যদি প্রত্যেক ইংরেজ শিশু এই সব জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর-ভাবে সংযুক্ত হবার সুযোগ পায় তবে সে এখনকার

চেয়ে আরো বেশী করে তার স্বজাতির মানুষদের চিনতে ও বুঝতে পারবে ; এবং সেই চেনবার ও বুঝবার ফলে তাদের বেশী করে ভালবাসতে শিখবে, এবং তাদের সঙ্গে তার আত্মার ও প্রকৃতির যে গভীর সংযোগ তা উপলব্ধি করে সে এখনকার চেয়ে আরো বেশী পরিমাণে আদর্শ পৌরজন ও স্বদেশপ্রেমিক হয়ে উঠবে।

"সুতরাং ইংরেজী লোকসঙ্গীতের পুনঃপ্রচলনের ফলে যাঁরা স্বদেশপ্রেমিক ও যাঁরা দেশের শিক্ষা-নেতা তাঁদের হাতে একটি মহামূল্যবান শক্তি এসে পড়েছে। জাতির বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে স্বজাতীয় সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ সংযোগ কেবল যে দেশের সঙ্গীত-ধারার প্রকর্ষ সাধন করবে তা নয়, তাতে করে স্বভূমির প্রতি এমন একটি গভীর প্রেমের এবং স্বজাতির প্রতি এমন একটি গৌরব-বোধের সৃষ্টি হবে যার অভাব আমরা আজকাল বিশেষ করে আক্ষেপ করি।"

ইংরেজ মনীষী সেসিল সার্প ইংলণ্ডের তৎ-কালিক শিক্ষা-প্রণালীর ও ইংলণ্ডের মানুষের সম্বন্ধে উপরোক্ত বাক্যে যা কিছু বলেছেন তার

প্রত্যেকটি কথা বর্ত্তমানকালে বাংলাভূমির ও ভারতের অন্যান্য প্রত্যেক বিশিষ্ট ভূমির শিক্ষা-প্রণালীর ও মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে প্রযুজ্য। স্বজাতি গঠন কবতে হলে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ চাই স্বজাতির নিজস্ব সংস্কৃতি-ধারাব সঙ্গে, বিশেষ করে নিজস্ব ছন্দ-সংস্কৃষ্টি-ধাবার সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংযোগ। "ব্যক্তি" কথাটার প্রকৃত ও গূঢ় মর্ম্মার্থই হচ্ছে এই যে সে তাব স্বভূমিব ছন্দ-প্রধাবার ব্যক্তি বা প্রকাশ। সুতরাং জাতির মানুষকে যদি তার স্বভূমির ছন্দ-সংস্কৃষ্টির-প্রধারার 'ব্যক্তি'-স্বরূপ করে গঠিত হবাব সুযোগ ও শিক্ষা না দেওয়া হয় তবে সে প্রকৃতপক্ষে স্বজাতীয়তা লাভ করতে পারে না,—জাতির স্ব-ছন্দের সঙ্গে, স্ব-ভাবের সঙ্গে, স্ব-ধারার সঙ্গে তার সংযোগ হয় না—এবং তার ফলে জাতির গভীর অন্তরাত্মার সঙ্গে সে নিজের প্রাণের সংযোগ স্থাপন করতে পারে না।

বাংলা ভূমির সংস্কৃষ্টিমূলক গৌরবময় ছন্দ-প্রধারাবলী রায়বেঁশে, ঢালী, কাঠি, জারি, বাউল, কীর্ত্তন, ঝুমুর ও বাংলার মেয়েদের ব্রতনৃত্যের

রূপে আবহমানকাল থেকে জাতির জীবনের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষার ভ্রান্ত আদর্শের ফলে এই জাতীয় মহা-সম্পদের মহামূল্যবান ইতিধারাগুলি গত এক শতাব্দীর মধ্যেই তথাকথিত ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের দ্বারা বর্জ্জিত হয়ে নিরক্ষর ও দরিদ্র পল্লীবাসীগণ কর্ত্তৃক সুদূর পল্লীতে পল্লীতে রক্ষিত হয়ে আসছে। আমি আজ কয়েক বৎসর থেকে এই জাতীয় সম্পদধারাগুলিকে পুনরায় সমগ্র জাতির জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে জাতিকে শক্তিমান, তেজোবান ও জীবন্ত করতে যে চেষ্টা ব্রতচারী প্রণালীর ভিতর দিয়ে করে আসছি, কেহ কেহ তাকে প্রগতির বিরোধী বলে অভিমত প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন নি। এই অভিমত যে নিতান্ত ভ্রান্তিপ্রসূত ও অজ্ঞতার পরিচায়ক, পূজনীয় রবীন্দ্র-নাথের মত মহামনীষীর নিম্নে উদ্ধৃত অভিবাণী থেকেই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। কয়েক বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ লেখককে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন, তার থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল :—

"বিদেশ থেকে ফিরে এসে আপনার আর একটি যে অধ্যবসায় দেখলুম তাতে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়েছে। দেশের স্বাস্থ্য এবং অন্নের সংস্থান খুবই জরুরি সন্দেহ নেই—কিন্তু আনন্দের প্রকাশ তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয়। দেশের জনসাধারণ বলতে যাদের বোঝায় সেই পল্লীবাসীরা তাদের নৃত্যে গীতে কাব্যকলায় অজস্রভাবে প্রাণেব আনন্দ প্রকাশ করেছে। মরা নদীর মাঝে মাঝে জলকুণ্ডেব মতো এখনো তার অবশেষ দেখা যায়, কিছুদিনের মধ্যে তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হবে এমন আশঙ্কা আছে। আমাদেং শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মূঢ়তা তার অন্যতম কারণ। আমরা গ্রন্থকীট, দেশের গভীর প্রাণপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ নেই। আমরা ইংরেজি ইস্কুলের "ইস্কুল বয়"—সেইজন্যে পুঁথির নজীর অনুসরণ করে' বিদেশীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে পণ্ডিতী করতে আমাদের উৎসাহ, কিন্তু সেই রসবোধ নেই যাতে ঘরের কাছে সাধারণের মধ্যে যে সব সৌন্দর্য্যপ্রকাশের উপকরণ আছে তার যথাযোগ্য মূল্য নিরূপণ করতে পারি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে নৃত্য। সরস্বতীর এই

মহম্মদানকে আমাদের ভদ্রসমাজ অবজ্ঞা করে' পেশাদারের ঘরে ঠেলে দিয়েছে—জনসাধারণের মধ্যে আড়ালে আবডালে কিছু কিছু আছে সসঙ্কোচে—আপনি তাকে অখ্যাতি থেকে মুক্ত করে' সর্ব্বজনের মধ্যে তার আসন করে' দেবার চেষ্টা করছেন, এ একটা বড় কাজ। সকল রকম আনন্দের প্রকাশ মানুষের প্রাণশক্তিকে জাগরূক করে' রাখে; মানুষ কেবল অন্নের অভাবে মরে না—আনন্দের অভাবে তার পৌরুষ শুকিয়ে মারা যায়। আপনি পল্লীর পুরাতন রায়বেঁশে নাচকে নতুন আবিষ্কার করেছেন, এ রকম পুরুষোচিত নাচ দুর্লভ। এই নাচের উৎসাহকে আপনি ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যেও সঞ্চারিত করে' দিচ্ছেন। পাশ্চাত্য মহাদেশে নৃত্যকলা পৌরুষেরই সহচরী। আমাদের দেশেরও চিত্ত-দৌর্ব্বল্য দূর করতে পারবে এই নৃত্য। তাই আমি কামনা করি আপনার চেষ্টা ব্যাপক হোক সার্থক হোক।

২৭শে ফাল্গুন, ১৩৩৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

ব্রতচারী নৃত্যগুলির স্থান বাংলার জাতীয় জীবনে অতি উচ্চে। বাংলার জাতীয় জীবনের

পুনঃসংগঠনে এদের কার্য্যকারিতা অপরিহার্য্য ও অমোঘ। কেহ কেহ ভ্রান্তিবশতঃ এ গুলির কোন কোনটিকে সাঁওতাল নাচ বলে ভ্রম করে থাকেন। ইহাও নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। যে সকল নৃত্য ব্রতচারী পদ্ধতিতে গৃহীত হয়েছে তার কোনটিই বাঙ্গালীর ছাড়া অন্য জাতির নয়। এদের প্রত্যেকটি আমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষদের কর্ত্তৃক সংসৃষ্ট ও বহুযুগব্যাপী চর্চ্চাদ্বারা পূত। বাংলা-ভাষার মতই এগুলি শাশ্বত বাঙ্গালী জাতির আবহমান জীবন-সংস্কৃতিধারার রূপায়িত আনন্দ-প্রবাহ। জাতীয় জীবনে ও শিক্ষাপ্রণালীতে ইহাদের সযত্নে পুনঃ-পরিগ্রহণ ব্যতিরেকে, কি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কি সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন অসম্ভব।

ব্রতচারীর ছন্দ-সাধনা

ব্রতচারী পবিচেষ্টার যে পরিপূর্ণতার কথা বলা হয়েছে, ব্যক্তিব এবং জাতির বাস্তব জীবনে তাকে ফুটিয়ে তুলতে হলে ব্রতচারী আদর্শের সম্যক উপ-লব্ধিব প্রয়োজন। এই সম্যক উপলব্ধির অভাবে এ দেশে আজকাল অনেকে ব্রতচারী সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন এবং একে একটা নৃত্যের পদ্ধতি বলে মনে করেন। ব্রতচারী পরিচেষ্টার মধ্যে নৃত্যের যে একটি বিশেষ স্থান আছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নৃত্য এর একটা সাধনা-পন্থা মাত্র, ইহা লক্ষ্য স্থানীয় নয় এমন কি প্রধান কৃত্যও নয়। একটি প্রকাশ্য সভায় শ্রীমতী সরলা দেবী বলেছেন যে, নৃত্য ব্রতচারা প্রগতির বাইরের শরীরটা মাত্র; তার ব্রতগুলি হচ্ছে তার ভিতরের আত্মা। ব্রতচারী অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য এবং কৃত্য যদি নৃত্যই হত তা হ'লে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ বলতেন না—"এই ব্রতচর্য্যা পালন করলে প্রাণের আনন্দ, কর্ম্মের শক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা ও লোকহিত-সাধনের উৎসাহ দেশে

বল লাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই।" এ থেকে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই বোঝা উচিত যে ব্রতচারীকে বুঝতে হ'লে তার আত্মস্বরূপ ব্রত এবং পণ-মানাগুলিকে বিশেষ করে বুঝতে হবে। যাঁরা এটাকে একটা নাচের হুজুগ মনে করবেন, তাঁরা শুধু নিজেদের পল্লবগ্রাহিতার পরিচয় দেবেন মাত্র।

এখন প্রশ্ন হবে, ব্রতচারী যদি শুধু নাচ-গান না হয়, তবে ব্রতচারী কি? আমরা আগেই বলেছি—ব্রতচারী মানুষের জীবনের পূর্ণসিদ্ধির পূর্ণাঙ্গ সাধনা। বাস্তবপক্ষে কেবল মানুষের জীবনের নয়—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণসিদ্ধির পূর্ণাঙ্গ সাধনার উপকরণ এতে রয়েছে। এটা আমরা যতই তলিয়ে দেখব, ততই বুঝতে পারব। এই পূর্ণসিদ্ধি এবং পূর্ণাঙ্গ সাধনাকে দুই দিক থেকে দেখা যায়। একটা লক্ষ্যের দিক থেকে—একটা সাধনা-পন্থার দিক থেকে। লক্ষ্যের দিক থেকে ব্রতচারীর পরিপূর্ণ আদর্শ আমরা পাই—জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য, আনন্দ—এই পঞ্চব্রতের মধ্যে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, কি বৌদ্ধ, এই পঞ্চব্রতের মধ্যে সকলেই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের একটা সমসাধারণ

পরিপূর্ণ আদর্শ পাচ্ছেন। ব্রতচারী নিজেকে একটা ধর্ম্ম বলে জাহির করে না; কিন্তু ব্রতচারী এই দাবী করে, যিনি যে ধর্ম্মের লোকই হন, ব্রতচারীর এই পঞ্চব্রতমূলক আদর্শ গ্রহণ করলে তিনি তাঁর নিজের ধর্ম্মের মর্ম্মকথা আরও গভীরভাবে এবং আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন। এটাও সাহস করে বলা যেতে পারে যে কোন কোন ধর্ম্মের আদর্শের মধ্যে—শ্রমের এবং আনন্দের স্থান বিশেষ ভাবে লক্ষ্য হয় না, এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে অনেক ধর্ম্মের বিরোধ ঘটেছে বা ঘটবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ব্রতচারীর পঞ্চ-ব্রতমূলক আদর্শে এমন একটা অভিনব আধ্যাত্মিক সমন্বয় বিশ্বমানবকে দান করা হয়েছে, যাতে করে সে পূর্ণাঙ্গ যোগের অতি সহজ প্রণালীর সংসারিক জীবনের মধ্যে সাধনা অতি সহজভাবে করে নিতে পারবে।

এটা হল লক্ষ্যের দিক থেকে। কিন্তু খালি মানসিক লক্ষ্যে কি কর্ম্ম জগতে কি আধ্যাত্মিক জগতে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। সাধারণ লোকের পক্ষে জীবনের পূর্ণযোগে সিদ্ধিলাভ করতে হলে ছন্দাত্মক

সাধনার পথ অবলম্বন করতে হবে। এই সত্যটি ব্রতচারীর একটা বৈশিষ্ট্যমূলক আবিষ্কার।

সুতরাং আমরা ব্রতচারীতে প্রধানতঃ পাই এই দু'টি বিভাগ—পঞ্চব্রত এবং ছন্দাত্মক সাধনা।

ছন্দাত্মক সাধনার প্রয়োজনের বিষয়ে আমরা এখন বিশেষ করে আলোচনা করব। দু-একজন মহাত্মা অথবা ঋষির পক্ষে নিস্তব্ধ ধ্যানশক্তির প্রয়োগদ্বারা চরিত্রের উপর পূর্ণ আয়ত্তস্থাপন, দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয় এবং অদ্বৈততা অনুভূতি এবং জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ সাধন সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে তা অসম্ভব। সাধারণ লোককে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে সিদ্ধিলাভ করতে হলে, যেতে হবে ছন্দাত্মক সাধনার পথ দিয়ে। এটা ব্রতচারীর একটা মূলীভূত কথা। যে সত্যের উপর ব্রতচারীর এই বৈশিষ্ট্যমূলক আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত, তা-ই তাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বযুগে মানুষের জীবনের পূর্ণযোগ-সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রণালীর আসনে স্থান দেবে, এ নিঃসন্দেহ।

এক কথায় বলতে গেলে, এটা বলা চলে যে

ব্রতচারীর ছন্দ-সাধনা

তুমি যদি ব্রতচারী না হও, তা হলে তুমি পূর্ণ নও। ব্রতচারীর ছন্দ-সাধনা যদি না করে থাক তা হলে বাস্তবিক পক্ষে তুমি অশিক্ষিত—হও তুমি বড় বৈজ্ঞানিক, হও তুমি বড় দার্শনিক, হও তুমি বড় রাষ্ট্রনেতা। কেন না, যদি তোমার ছন্দ-সাধনা না হয়ে থাকে তা হলে বিশ্বমানবের জীবনের সঙ্গে তোমার ঐক্য অথবা অদ্বৈততার আশা দূরে থাকুক, তোমার নিজের মধ্যেই তুমি দেহ, মন ও আত্মার বিরোধ স্খালন করে সমন্বয় এবং সমগ্রতা স্থাপন করবার প্রাথমিক প্রণালীর অভ্যাস কর নি। ছন্দের অভ্যাস যে করে নি, তার জীবন অপূর্ণ ও অন্তর্বিরোধময়।

কেহ যেন মনে না করেন, যে এটা একটা অবৈজ্ঞানিক খামখেয়ালী কথা। শ্রেষ্ঠ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো—যিনি সমগ্র আধুনিক ইউরোপ-আমেরিকার মন্ত্রগুরু—তিনি স্বয়ং এই কথার সত্যতা ঘোষণা করে গিয়েছেন এবং বলেছেন, যে মানুষ ছন্দের শিক্ষা না পেয়েছে, যে মানুষ নৃত্য ও গীতের অভ্যাস না করেছে, সে মানুষের শিক্ষা অসম্পূর্ণ—সে বাস্তবিক শিক্ষিত নয়। প্লেটোর

বিধান অবলম্বন করে গ্রীসের প্রত্যেক রাজ্য নৃত্যসাধনাকে প্রত্যেক মানুষের এবং প্রত্যেক বালক-বালিকার শিক্ষার ও সাধনার একটা প্রধান ও অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করেছিল। এবং তা করেছিল বলেই আজ আধুনিক জগতের লোক প্রাচীন গ্রীকদের কি শারীরিক কি মানসিক সৌন্দর্য্যের সমন্বয়ের এবং শক্তির অভাবনীয় প্রকাশ দেখে বিস্মিত হয়। মোট কথা, ছন্দাত্মক সাধনাই ছিল গ্রীসের অভাবনীয় সর্ব্বতোমুখী সিদ্ধির গূঢ় পন্থা। সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্‌কে জীবনে আনতে হলে ছন্দাত্মক সাধনা ছাড়া উপায় নেই, এটা আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনেতাগণকে এবং বর্ত্তমান শিক্ষানেতাগণকে বুঝতে হবে; এবং বুঝে কার্য্য-ক্ষেত্রে তদনুরূপ বিধান করতে হবে—নিজের জীবনে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে।

এটা আমরা বলছি খালি প্লেটোর কথা এবং গ্রীসের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে নয়। গ্রীসের জন্মের বহুপূর্ব্বে ভারতের মানুষ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ছন্দাত্মক রহস্যের কথা আবিষ্কার করে ঘোষণা করেছিল। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে একটা অখণ্ড

সত্তা এবং সেই অখণ্ড সমগ্র সত্তার এবং তার প্রতি অংশ, এবং প্রতি অংশের প্রতি অণু-পরমাণু যে অবিরাম গতিশীল ও ছন্দশীল, এই সত্য বিশ্বের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে আবিষ্কার ও ঘোষণা হয়েছিল ভারতভূমিতে। পাশ্চাত্য জগতে এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার করতে দু'তিন হাজার বছর লেগেছে, এবং তার আগে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কথা দূরে থাকুক —কেবল মাত্র পৃথিবী যে চলমান ও ছন্দশীল, এই কথাটুকু বলার স্পর্দ্ধার জন্য গেলিলিও প্রভৃতিকে প্রাণদান করতে হয়েছিল। তারও বহু সহস্র বছর আগে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে একটা গতিশীল ও ছন্দশীল সত্তা, তা তার 'জগৎ' আখ্যা থেকে ভারতের ছোট বড় প্রত্যেক মানুষের একটা দৈনন্দিন সাধারণ জ্ঞানের বিষয় ছিল। এবং খালি জ্ঞানের বিষয় নয়, কর্ম্মের ক্ষেত্রে এবং ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সেই জ্ঞানের মর্ম্মকথা কার্য্যত প্রয়োগ করা হয়েছিল ছন্দের সাধনায়। ভারতের জীবনে তখন কর্ম্মে এবং ধর্ম্মে বিযুক্ততা ছিল না ; কর্ম্ম ছিল ধর্ম্মাত্মক এবং ধর্ম্ম ছিল কর্ম্মাত্মক এবং উভয়ই ছিল

ছন্দাত্মক। এক কথায় জীবনের সাধনা ছিল অখণ্ড এবং ছন্দের দ্বারা সমন্বিত। তা ছিল বলেই প্রাচীন ভারত আধ্যাত্মিক জীবনে এবং দর্শনের ক্ষেত্রে যুগ যুগ ব্যাপী প্রাধান্য এবং প্রখ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

কেবল যে হিন্দু ধর্ম্মে ছন্দ-সাধনার পন্থা গৃহীত হয়েছিল তা নয়। খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রথম যুগেও ছন্দের সাধনা ঐ ধর্ম্মের উপাসনার একটা প্রধান অঙ্গ স্বরূপ ছিল। এটা আমাদের মনগড়া কথা নয়। ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী হ্যাভেলক এলিস (Havelock Ellis) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ডান্স অব লাইফ" (জীবন-নৃত্য)-এ এ কথাটা অতি স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি আক্ষেপ করেছেন, নৃত্যের সঙ্গে ধর্ম্মসাধনার বিচ্যুতি যে দিন হয়েছে, সেদিন থেকে খৃষ্ট-ধর্ম্ম তার আধ্যাত্মিক শক্তি হারিয়েছে। এবং তিনি বলেছেন, আবার যদি ইউরোপে বর্ত্তমান পণ্ডিতী ও পৌরহিত্য-প্রধান ধর্ম্মের স্থলে কখনো একটা জীবন্ত ও প্রাণবান ধর্ম্ম আসে, তবে সে একটা নৃত্যের রূপে আসবে।

সমষ্টিগত ভাবে ছন্দের একটা বিরাট ঐক্য

সংগঠনী শক্তি আছে। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ লোক যখন অতি সহজ ভাবে কায়, মন এবং বাক্যের সহজ ছন্দে সমন্বিত হয় তখন তাদের মধ্যে এক অভাবনীয় ঐক্য এবং অদ্বৈততার সৃজন হয়।

ব্যক্তির ও সমষ্টির জীবনে কায়, মন ও বাক্যের ছন্দ-সাধনার এই যে বিরাট ঐক্য বিধায়িনী ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পাদনের অমোঘ শক্তি—ইহাই ব্রতচারী নৃত্যের প্রাণবস্তু। ব্রতচারীর বৈশিষ্ট্য এই যে, বর্ত্তমান যুগে মানুষের জীবনকে প্রাণবন্ত এবং সর্ব্বাঙ্গীণ শক্তিমান করে তোলবার জন্য ব্রতচারী এই ছন্দ-সাধনার অমোঘ শক্তিকে কোন বিশেষ কোঠায় আবদ্ধ করে রাখে নি। কর্ম্ম, ক্রীড়া এবং শিক্ষা নির্ব্বিশেষে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সেই ছন্দের অভিসিঞ্চন মানুষের জীবনে পূর্ণ সিদ্ধিলাভের পথ সহজ করে দেয়। সুতরাং ব্রতচারী নৃত্য যে একটা হাসির, বিদ্রূপের, তাচ্ছিল্যের অথবা কেবল মাত্র একটা বাহ্যিক অভিনয়ের বস্তু নয়, এই কথা যে বুঝতে না পারবে, সে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত মহাশক্তির মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ।

ব্রতচারী-শক্তি

বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা যে সমগ্র মানব জাতিকে একটা ভ্রান্ত আদর্শের দিকে—একটা ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাচ্ছে, আজকাল এশিয়া-ইউরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এর উপলব্ধি করছেন। এটা বিশেষ করে বোঝা যায় আজকাল ইউরোপে গেলে এবং ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে আলাপ করলে। সম্প্রতি ইউরোপে গিয়ে আমার এই কথাটা বুঝবার বিশেষ সুযোগ হয়েছে। ইউরোপ জীবনের অনেকক্ষেত্রে আশাতীত সফলতা লাভ করেছে; কিন্তু সেই আশাতীত সফলতার মধ্যে ইউরোপের মনীষীগণ একটা চূড়ান্ত নিষ্ফলতার গভীর অনুভূতিতে ব্যথিত হচ্ছেন, যার বাহ্যিকরূপ আজকাল ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবনের ব্যাপারে বিশ্বের সামনে বিশেষভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক প্রগতির শতসহস্র সফলতার মধ্যে এই যে গভীর নিষ্ফলতার একটা চূড়ান্ত প্রকাশ, এর কারণ বিনির্দ্দেশ এক কথায় করতে হলে

বলতে হয়—বর্ত্তমান যুগে জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শ থেকে মানবজাতির বিচ্যুতি।

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ আজকাল হাহাকার করে চীৎকার করেছেন—চাই জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শ। কেউ তা খুঁজছেন প্রাচীন গ্রীক-সংস্কৃতির মধ্যে, কেউ খুঁজছেন খৃষ্ট-ধর্ম্মের নৈতিক আদর্শের মধ্যে, আর কেউ বা খুঁজছেন নবযুগের রাশিয়ান সোভিয়েট বা কমিউনিষ্ট আদর্শে। কিন্তু এই তিনটার মধ্যে কোনটাই তাদের মানব-জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শ যোগাতে সক্ষম হয় নি।

ভারতের জীবনে প্রাচীনকালে মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ অখণ্ড আদর্শের জীবন্ত প্রকাশ হয়েছিল; এবং ভারতবর্ষ থেকে এই অখণ্ড আদর্শ পৃথিবী যে আবার পাবে, এই আশা ও বিশ্বাস ইউরোপের মনীষীদের মনে ক্রমশই গভীরতর ভাবে বদ্ধমূল হয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, ব্রতচারী-পদ্ধতির ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ তার নিজস্ব অখণ্ড আদর্শ-মূলক সংস্কৃতির বহুমূল্য দান বর্ত্তমান জগৎকে আবার করতে উদ্যত হয়েছে—এটা উপলব্ধি করে তাঁরা ব্রত-চারী পরিচেষ্টাকে অতি সমাদরে বরণডালা দিয়েছেন।

আধুনিক যুগে মানুষ তার জীবনকে বহুধা খণ্ড-বিখণ্ড করেছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে। যথা—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শিক্ষা, ক্রীড়া,—দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং প্রত্যেকের উপযোগী বিভিন্ন সাধনার মধ্যে—জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তার বিভিন্ন কোঠায়। জীবনের এই খণ্ড-বিখণ্ডতার ফলে বর্ত্তমান সভ্যতা অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং জড়জগতে অভাবনীয় শক্তিলাভ সত্ত্বেও গভীর নিষ্ফলতায় পর্য্যবসিত হয়েছে।

কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হবে যে, ব্রতচারীর এই বৃহত্তর মর্ম্মার্থ এবং সম্ভাবিতব্যতার উপলব্ধি ভারতে এবং বাংলায় এখনও খুব কম লোকেরই হয়েছে। এখন সময় এসেছে, এই বৃহত্তর উপলব্ধি জাগরণের; এবং তার ফলে বাংলার ও ভারতের জীবনকে বর্ত্তমান অধঃপতনের গভীর গহ্বর থেকে টেনে তুলে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে চালিত করবার; আর তার দৃষ্টান্ত দিয়ে পৃথিবীর জীবনকে পরিপূর্ণ আদর্শের পথে পরিচালিত করবার।

ব্রতচারী পদ্ধতিতে মানুষের জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণ আদর্শের সমাবেশ হয়েছে, এর অনুভব যে

বিশ্বের মানব-সভায় আসতে আরম্ভ হয়েছে তার প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই ও আগষ্ট মাসে ইউরোপে তিনটি বিশ্ব-মানব মহাসভার অধিবেশন হয়েছিল। একটি ধর্ম্ম বিষয়ক—সর্ব্বধর্ম্ম মহাসভা (World Congress of Faiths), এটা হয়েছে লণ্ডনে; মহারাজা গাইকোয়াড় এর অধিনেতা, স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড এর আহ্বানকারী। দ্বিতীয়টি ইংলণ্ডের চেল্টনহ্যাম শহরে—বিশ্বশিক্ষা মহাসভা (Seventh World Conference of the New Education Fellowship). তৃতীয়টি জার্ম্মাণীর হ্যামবার্গ (Hamburg) শহরে আহুত হয়েছে—তার নাম ক্রীড়া ও পুনঃপ্রাণণ বিশ্ব-মহাসভা (World Congress for Leisure-time and Recreation).

এই তিনটি অতি-বিভিন্ন ব্যাপারের বিশ্ব মহাসভায় ব্রতচারীর সমান সাদর নিমন্ত্রণ যে আসতে পারে, একথা অনেকেরই হয়তো বিশ্বাস হবে না! কিন্তু সত্যই ইহা ঘটেছে। এ থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি?—এই বুঝতে পারছি যে বর্ত্তমান যুগে বিশ্বের মানুষ তার জীবনকে বিভক্ত করেছে ভিন্ন

ভিন্ন কোঠায়। যথা—ধর্ম্ম, শিক্ষা (দৈহিক, মানসিক, নৈতিক), ক্রীড়া ইত্যাদি। কিন্তু এই তিন বিভিন্ন কোঠা থেকে তারা একসঙ্গে হাত বাড়াচ্ছে ব্রতচারীর পরিপূর্ণ ভাণ্ডারে। এক ব্রতচারী আদর্শই তাদের পারস্পরিক বিভিন্নতাকে বিচূর্ণ করে তাদের মধ্যে গভীর এবং ঘনিষ্ঠ সংযোগস্থাপন করতে পারবে; এবং বিশ্বমানুষের বর্ত্তমান শতধা খণ্ড-বিখণ্ড জীবনকে আবার পরিপূর্ণতার সন্ধান দিতে পারবে।

তাই লণ্ডনে ক্যাক্সটন হলে বাংলার নিজস্ব পল্লী-রসকলা সম্বন্ধে আমি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলাম, তখন সভাপতির আসন থেকে ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি ও শিক্ষাচার্য্য লরেন্স বিনিয়ন বলেছিলেন—

> সমগ্র পৃথিবী জুড়ে, বিশেষ করে পশ্চিম জগতে—আমাদের বস্তুতান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে আমরা কেমন করে যেন জীবনের সমগ্রতা হারিয়ে ফেলেছি—কেমন করে যেন জীবনের ছন্দ হারিয়ে ফেলেছি।
>
> দত্ত মহাশয় ব্রতচারী ও অন্যান্য যে সব পরিচেষ্টা আরম্ভ করেছেন—আমার মনে হয়, তাদের লক্ষ্য জীবনের এই সমগ্রতা এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির লুপ্ত সংযোগ পুনঃ স্থাপন করা।

তাই বলি, বাংলার মানুষ বুঝুক, তাদের আজ কি মহা গৌরবময় অধিকার এসেছে। বিশ্ব আজ গভীর অন্ধকারের মধ্যে যে আলোর জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছে, সেই আলোর মশাল জ্বালিয়ে তুলে বিশ্বপ্রগতির পথ দেখাবার—ব্রতচারী-আদর্শকে সমগ্র বাংলার জীবনে সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণ ভাবে ফুটিয়ে তুলে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির পরিপূর্ণ আদর্শের জীবন্ত দান বিশ্বকে করবার এই বিরাট অধিকার বাঙ্গালী আজ গ্রহণ করুক স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে—বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া নির্ব্বিশেষে—জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে।

ব্রতচারী আদর্শ শুধু যে একটা নাচ-গানের ব্যাপার, এই মূঢ় বিশ্বাস যাদের মধ্যে এখনও আছে, তাদের সে ভ্রান্তবিশ্বাস আজ ঘুচুক। ফুটবল, ক্রিকেট, স্কাউটিং, নানাবিধ খেলা—বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক নানা-প্রকার জ্ঞান-বিকাশের প্রয়োজন যে নেই, তা আমরা বলি না; কিন্তু এগুলির সঙ্গে ব্রতচারীর পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তার তুলনা যে করে, সে বর্ত্তমান যুগের সমস্যা ও তার সমাধানের পন্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কেউ কেউ আবার বাংলার ব্রতচারী আদর্শকে "প্রাদেশিকতা" মাত্র বলে ভ্রম করেন। তাদের

বুঝতে হবে, তাঁরা যাকে প্রাদেশিকতা মনে করেন, সেটাই আসল জাতীয়তা। বিভিন্ন প্রদেশ নির্বিশেষে ভারতের সংস্কৃতির একটা সমতার বৈশিষ্ট্য যে আছে, এটা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এটা ভুললে আর চলবে না যে সমগ্র ভারতের সম-সংস্কৃতির মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশের জাতীয়তার যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য, তাকে উপেক্ষা আমরা যতদিন করব, ততদিন কি ভারত-মানবতা কি বিশ্ব-মানবতার ঐক্যের সন্ধান পাওয়া আমাদের সম্ভব হবে না। মোটকথা, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যাকে প্রদেশিকতা বলা চলে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেটা মানুষের জীবনের মর্মীভূত গভীর জাতীয়তার বৈচিত্র্যের প্রকাশ। সেই সংস্কৃতিগত জাতীয়তার বৈচিত্র্যকে সাদরে স্বীকার করে, তার সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় লাভ করে, তাকে যদি বাংলার জীবনে সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা বাঙ্গালী না করে—প্রাদেশিকতার খোঁটার ভয়ে লজ্জায় ও সঙ্কোচে বাঙ্গালী যদি এখনও বাংলার নিজস্ব জাতীয় বৈচিত্র্যকে তার জীবনে গভীর-ভাবে ফুটিয়ে তুলবার সাধনা না করে, তা হলে সে না পারবে বাংলাকে না পারবে বিশ্বকে সেই দান দেবার—যে দানের জন্য বাংলার মাটি, হাওয়া, জল, ফুল,

ফলের,—বাংলার ভাষা, কলা, নৃত্য ও গানের সম্পদের উত্তরাধিকারী অথবা এক কথায় বাংলার শক্তির উত্তরাধিকারী ভগবান বাঙ্গালীকে করেছেন। আমাদের জাতীয়তার প্রকৃষ্ট পরিণতি ও পরিচয় হবে বাংলার সংস্কৃতির নিবিড় প্রকাশে; একমাত্র তাতে করেই আমরা ভারত-মানবতা ও বিশ্ব-মানবতার ক্ষেত্রে আমাদের বৈশিষ্ট্যের দান করতে পারব। নতুবা আমাদের জীবন হবে অর্থহীন ও মূল্যহীন।

তাই ব্রতচারী আদর্শে একদিকে যেমন আছে, প্রত্যেক বিশিষ্ট জাতির নিজস্ব বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি-বিকাশের সাধনা পন্থার নির্দ্দেশ, অপরদিকে তেমনি আছে বিশ্বমানবের সেবাধর্ম্মের প্রতি নির্দ্দেশ। দেহের, মনের, চরিত্রের এবং আধ্যাত্মিক প্রগতির সাধনা-পন্থা এতে একাধারে নিহিত আছে; আর তার সঙ্গে আছে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব সংস্কৃতির ক্রমধারার সাধনা-পন্থার গতি-নির্দ্দেশ; আর সর্ব্বোপরি আছে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ কি ধর্ম্মে কি ক্রীড়ায় কি শিক্ষায় কি দৈহিক মানসিক চারিত্রিক ক্ষেত্রে, কি ব্যক্তিগত কি সমষ্টিগত জীবনে—আনন্দের অপূর্ব্ব অভিসিঞ্চন। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সাধনার দিক থেকে আনন্দের উপর

সবচেয়ে এই যে বলিষ্ঠ অনুবিধান—সহজ সরল নৃত্য-গীতের ভিতর দিয়ে শব্দ ও গতিছন্দের এই যে আনন্দময় সাধনা—একে আজ জগতের শিক্ষা-বৈজ্ঞানিকগণ ব্রতচারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এবং ব্রতচারীর মধ্য দিয়ে বর্ত্তমান জগৎকে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছেন। আর এটাও স্বীকার করছেন যে, ব্রতচারীর পঞ্চব্রত—জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য, আনন্দ—এর ভেতর দিয়ে ভারতের সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে ব্রতচারী-প্রতিভার বর্ত্তমান যুগোপযোগী পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে।

ব্রতচারীর পথ-গানা যাঁরা এখনও ছেলেখেলার জিনিস বলে মনে করেন, তাঁদের এখন বুঝবার সময় এসেছে, যে এগুলি ছেলেখেলা নয়; এগুলি মানুষের পরিপূর্ণ অখণ্ড জীবন আদর্শের মন্ত্র-সাধনার সহজ অথচ গভীর ফলপ্রদ প্রণালী। এই মন্ত্র-সাধনার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চর্চ্চার ভিতর দিয়ে বাঙ্গালী শুধু ভারতে নয়—সমগ্র বিশ্বের মধ্যে আবার নিজেকে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত ভাবে—কি দৈহিক—কি মানসিক—কি চারিত্রিক—কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মহা শক্তিমান করে তুলবে। ব্রতচারী-আদর্শের সাধনা শুধু ভারতের নয়,

সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্বভার গ্রহণ করবার গৌরবময় অধিকার বাঙ্গালী নরনারীর করায়ত্ত করে দেবে। ব্রতচারী-শক্তি ভারতকে ও বিশ্বকে সর্ব্বসমন্বয়পূর্ণ এক নূতন পথে পরিচালিত করে মানুষের জীবনে পূর্ণ সার্থকতার সন্ধান এনে দেবে।

পরিশিষ্ট

জ-সো-বা (১৭ পৃষ্ঠা) ও শা-শ্ব-বা (৭১ পৃষ্ঠা) গান দু'টি ছাপা হয়ে যাবার পর জ-সো-বা-র অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং শা-শ্ব-বা'য় একটি নূতন ছত্র সংযোজিত হয়েছে। গান দু'টি পরিবর্দ্ধিত আকারে পুনর্মুদ্রিত হ'ল।

জ-সো-বা

(জয় সোনার বাংলার)

চির বন্দ্য সুজলা ভূমি বাংলার—
জয় জয় সোনার বাংলার।
জয় জয় ভাষার বাংলার—
জয় জয় আশার বাংলার
জয় নব নারীর বাংলার—
ব্রত অনুচারীর বাংলার।
শস্যের শিল্পের শৌর্য্যের বীর্য্যের জ্ঞানের—
জয় অবদানের বাংলার।

শা-শ্ব-বা

(শাশ্বত বাংলা ও শাশ্বত বাঙ্গালী)

চন্দ্র-সূর্য্য-তারায় ভরা
ব্যোম ঘেরা এই বিশাল ধরা